ফাজায়েলে তিব্ব

নাজমুল আহসান রুহান

بسم الله الرحمن الرحيم

⬛ সুস্থ থাকার গুরুত্ব

وَ خُلِقَ الۡاِنۡسَانُ ضَعِیۡفًا

❝ আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। ❞ (সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৮)

মানুষ শরীর, মন, প্রবৃত্তি সব দিক দিয়েই সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। যার কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্ষতিকর এজেন্ট ও ফ্যাক্টর (যেমন, জীবাণু, বিষ, দুর্ঘটনা, আঘাত, জেনেটিক্যাল ত্রুটি, বদ অভ্যাস ও পরিবেশ প্রভৃতি)-এর শিকার হয়ে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে এবং পীড়া ভোগ করে। এই অবস্থাটিকে আমরা অসুস্থতা বলে থাকি। মানুষ অসুস্থ হলে সে আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, যার কারণে সে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে না এবং দুনিয়াবি দায়িত্বগুলোও ঠিকমত পালন করতে পারে না। এজন্য, ইসলামে সুস্থতাকে অন্যতম নিয়ামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এমন দু’টি নিয়ামত আছে, যে দু’টোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪১২; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, “তোমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা ঈমানের পর কাউকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার চেয়ে অধিক উত্তম কিছু দান করা হয়নি।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৮৪৯; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, “খোদাভীরু লোকদের জন্য ধন-সম্পদ থেকে সুস্থতা অধিক উত্তম। মনের প্রফুল্লতাও (তথা মানসিক সুস্বাস্থ্যও) নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২১৪১; সহিহ)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে লোক পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকী থাকে তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।” (জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৪৬; হাসান)

অসুস্থতা মানুষকে আরও দুর্বল করে দেয় আর দুর্বলতা মানুষের কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয় আর কর্মদক্ষতা কম হলে মানুষ দ্বীন ও সমাজের জন্য উপকারী হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য, ইসলামে মুসলিমদের দুর্বল হয়ে পড়া অপছন্দনীয়। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে শক্তিশালী দেখতে পছন্দ করেন। রাসুল ﷺ আল্লাহর কাছে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “শক্তিধর ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারের তুলনায় আল্লাহর নিকট উত্তম ও অতীব পছন্দনীয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে, যাতে তোমার উপকার রয়েছে তা অর্জনে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর। তুমি অক্ষম হয়ে যেও না।...” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৬৪; সহিহ)

➤ নবী ﷺ বলতেন, “হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই- দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণভার ও মানুষের প্রভাবাধীন হওয়া থেকে।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৩৬৯; সহিহ)

তাই, মুমিনদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত নিজেকে শক্তিশালী করা ও রাখা। আর সেজন্য অসুস্থতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া চাই। কেননা, রোগ-ব্যধি মানুষের শরীর ও মনের স্থায়ী-অস্থায়ী ক্ষতি সাধন করে থাকে। আর অহেতুক ক্ষতি থেকে বাঁচা ও বাঁচানোর চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ

❝ হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর। ❞ (সূরা আন নিসা, আয়াত ৭১)

➤রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, "ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৩৪০; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫১৯৯; সহিহ)

সুতরাং, প্রত্যেকে মুসলমানের উচিত নিজের শরীরকে সুস্থ-সবল রাখা। কেননা, শরীর তার উপর দেওয়া আল্লাহর একটি আমানত আর এই আমানত যত্ন পাওয়ার দাবি রাখে। আর শরীর যেহেতু মনের সাথে সংযুক্ত তাই মনকে সুস্থ রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

⬛ চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ

নিজেকে সুস্থ রাখা মানুষের কর্তব্য। আর এই কর্তব্য পালনের জন্য মানুষ অসুস্থ অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভের যে পথ অনুসন্ধান করে সেটিই হলো চিকিৎসা। সকল চিকিৎসার কার্যকারিতাই আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির উপর নির্ভরশীল। ইসলামে গ্রহণযোগ্য চিকিৎসাপদ্ধতি দুই প্রকার।

১. দ্বীনি চিকিৎসা:
কুরআনের আয়াত, নবী ﷺ বা সালাফে স্বলেহীন কর্তৃক বর্ণিত দোয়া বা আল্লাহর কোনো গুণবাচক নাম বা জায়েজ দোয়ার মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করা। এটি আল্লাহ কর্তৃক ওয়াহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত বা স্বীকৃত পদ্ধতি, যা রুকইয়া বা ঝাড়ফুক নামেও পরিচিত।

➤রাসুল ﷺ বলেন, "যেসব ঝাড়ফুঁক শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, তাতে কোন দোষ নেই।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৮৮৬; সহিহ)

২. দুনিয়াবি চিকিৎসা:
প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ঔষধ বা প্রতিষেধক প্রয়োগ করে, শরীরে কাটাছেঁড়া করে, জীবনযাপনে পরিবর্তন এনে বা অন্য কোনো উপায়ে রোগের ভৌত ও জৈবিক উপাদানকে প্রভাবিত করা। এটি মানুষের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণা দ্বারা আবিষ্কৃত পদ্ধতি।

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "তোমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে (যেমনঃ- কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি) তোমরাই ভাল জানো।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৩৬৩; সহিহ)

জিন, জাদু, নজর — জাতীয় সমস্যা বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে বিধায় সেক্ষেত্রে দ্বীনি চিকিৎসাই একমাত্র সমাধান। তবে, বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা— যেগুলোর সমাধান বিজ্ঞান উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে দোয়া-প্রার্থনার পাশাপাশি দুনিয়াবী চিকিৎসা নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, নিজে থেকে ফলাফল লাভের জন্য কোনো প্রকার চেষ্টা-সাধনা না করে আল্লাহর কাছে ফলাফল প্রত্যাশা করা— ইসলামের শিক্ষা নয়।

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “প্রতিটি ব্যাধির প্রতিকার রয়েছে। অতএব রোগের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২০৪; সহিহ)

➲ উক্ত হাদিসটির ব্যাখায় ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, “উল্লিখিত হাদীসে চিকিৎসা গ্রহণ মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর এটাই আমাদের ইমামগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মত।... এ হাদীসে কট্টরপন্থী সূফীগণ, যারা (দুনিয়াবী) চিকিৎসাকে অস্বীকার করেন তাদের কথাকে খন্ডন করা হয়েছে।” (শরহুন নববী আলা সহিহ মুসলিম, ২/২২৫)

সুতরাং, ইসলামে রোগের জন্য দুনিয়াবী চিকিৎসা নেওয়াকে অস্বীকার তো করা হয়ই নাই উলটো উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুল ﷺ নিজে তৎকালীন পার্থিব চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং অন্যদেরকে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামও তৎকালীন চিকিৎসাব্যবস্থার অনুসরণ করেছেন।

➤ বেদুইনরা রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি (রোগীর) চিকিৎসা না করি তবে কি আমাদের গুনাহ হবে?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা করো। কেননা মহান আল্লাহ বার্ধক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার সাথে প্রতিষেধকেরও ব্যবস্থা করেননি (রোগও রেখেছেন, নিরাময়ের ব্যবস্থাও রেখেছেন)।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৪৩৬; সহিহ)

➤ সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, “আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন এবং আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন। আমি আমার হৃদয়ে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম।

অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি হৃদরোগী, তুমি সাকীফ গোত্রের হারিস ইবনু কালাদাহ্‌র নিকট যাও; কারণ সে এসব রোগের চিকিৎসা করে। সে যেন মাদীনার আজওয়া খেজুর হতে সাতটি খেজুর নিয়ে বীচিসহ চূর্ণ করে সেগুলো তোমার মুখে ঢেলে দেয়।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৮৭৫; যইফ)

➤ রাসুলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনু কাব রাদিআল্লাহু আনহু এর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার একটি ধমনী কেটে দিল, পরে লৌহা পুড়িয়ে (রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য) তাতে দাগ দিয়ে দিল। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২০৭; সহিহ)

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তির (শরীর) যখম হয়েছিল। সেই যখমে রক্ত জমে গিয়েছিল। অতঃপর লোকটি বনী আনমার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে (উহার চিকিৎসার জন্য) ডেকে আনল। তারা এসে (যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে) দেখল। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে চিকিৎসায় অধিক অভিজ্ঞ?”

তারা বলল, “ইয়া রসূলাল্লাহ! চিকিৎসায় বিজ্ঞানে কোন উপকার আছে কি?”

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “(অবশ্যই!) ঔষধ তো তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি রোগ নাযিল করেছেন।” (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৬৯৯; মুরসাল)

সাধারণ অবস্থায় রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা নেওয়া মুস্তাহাব। তবে, রোগ যদি খুব গুরুতর হয় যে চিকিৎসা ছাড়া জীবন বাঁচানো অসম্ভব হয় এবং চিকিৎসা করানোর সামর্থ্যও থাকে; তখন চিকিৎসা নেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

➲ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যদি কোনো চিকিৎসা নিশ্চিতভাবে জীবন রক্ষাকারী হয় এবং তার বিকল্প কিছু না থাকে, তাহলে সেটি গ্রহণ করা ওয়াজিব। যেমন মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়া জীবন রক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কেউ যদি চরম অসুস্থ অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ না করে এবং এতে মারা যায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে।” (ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ১২/১৮)

ইসলাম যে শুধু মানুষের চিকিৎসা করাতে বলেছে এমন নয়; অধীনস্থ পশুপাখিদের চিকিৎসা করানোও মালিকের দায়িত্ব। কেননা, তাদের ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হবে।

➤ একবার রাসুল ﷺ এমন একটি উটের পাশ দিয়ে গেলেন, যে উটটির পেট অনাহারে পিঠের সাথে লেগে ছিলো। তিনি তখন সাহাবিদেরকে বলেন, "তোমরা এসকল বাকশক্তিহীন পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ-সবল পশুর পিঠে চড়বে আর এদেরকে উত্তমরূপে আহার করাবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫৪৮; সহিহ)

➤ একদা উমর রাদিআল্লাহু আনহু একটি উটকে দেখেন, যা ক্লান্ত বা অসুস্থ ছিলো। উমর রাদিআল্লাহু আনহু তার কাছে যান, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "আমার ভয় হয় যে আমি তোমার ব্যাপারে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেসিত হব।" (আত-তাবাক্বত, ৩/২১৫)

➤ আবু সাইদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু আবূ সা'সা'আহকে বললেন, "তোমাকে দেখছি তুমি বকরীকে অত্যন্ত ভালোবেসে এদেরকে সর্বদা লালন-পালন কর, তাই, তুমি এদের যত্ন কর এবং রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা কর।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬০০; সহিহ)

সুতরাং, মানুষ হোক বা প্রাণী প্রত্যেকের জন্য চিকিৎসাসেবা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলাম এটি সমর্থন করে। বর্তমানে অনেকে মনে করে ওষুধ সেবন না করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে থাকা উচিত, যা সঠিক নয়। কেননা, তাওয়াক্কুলের নিয়ম হচ্ছে আগে ক্ষতি মেটানোর জন্য সাধ্যমত দুনিয়াবি সকল ব্যবস্থা নেওয়া। এরপর আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভরসা রাখা এবং তার কাছে দোয়া-প্রার্থনা করা।

➤ কোন একজন লোক বললো, "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি কি সেটা (উট) বেঁধে রেখে আল্লাহর তা'আলার উপর ভরসা করবো, না বাঁধন খুলে রেখে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবো?"

তিনি বললেন, "তুমি সেটা বেঁধে রেখে (আল্লাহ্ তা'আলার উপর) ভরসা করবে।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫১৭, সহিহ)

বর্তমানে দুনিয়াবী চিকিৎসাব্যবস্থা অনেক প্রকারের রয়েছে। এর মধ্য হতে সেই চিকিৎসাব্যবস্থাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যার কার্যকারিতা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী। কেননা, ইসলাম সর্বদা আমাদেরকে প্রমাণভিত্তিক তথ্যকে গ্রহণ করার তাগিদ দেয়। আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভুল তথ্য শারীরিক ক্ষতি এবং অর্থ-সময়ের অপচয়ের কারণ হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে, দলীল-প্রমাণকে আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

قُلۡ هَاتُوۡا بُرۡهَانَکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ

❝ বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।' ❞ (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১১১)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَکُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوۡۤا اَنۡ تُصِیۡبُوۡا قَوۡمًۢا بِجَهَالَۃٍ فَتُصۡبِحُوۡا عَلٰی مَا فَعَلۡتُمۡ نٰدِمِیۡنَ

❝ হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়। ❞ (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ৬)

➤ নবী ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন কথা শোনামাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৯২; সহিহ)

তাই দুনিয়াবী চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিছক দর্শন বা অনুমান ভিত্তিক মতবাদ বা লোক-মুখে প্রচলিত কথার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ইসলাম আমাদেরকে চিকিৎসাক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করতে এবং নতুন কল্যাণকর বিষয়াদি আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা থেকে বিমুখ হওয়া উচিত নয়।

⬛ চিকিৎসাবিজ্ঞানের মর্যাদা ও গুরুত্ব

যে বিজ্ঞান মানুষ (অথবা কোনো প্রাণীর) শরীরকে বোঝার চেষ্টা করে; রোগ-ব্যাধির লক্ষণ, প্রক্রিয়া, প্রতিকার, প্রতিরোধ ইত্যাদির ব্যাখা প্রদান করে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা গঠন করে সেটাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান (Medical Science বা علم طب) বলে। মেডিসিন ও সার্জারী, ডেন্টিস্ট্রি, ভেটেরিনারি প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশবিশেষ।

কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের সৃষ্টি-গঠন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। কেননা এসব বিষয় জানা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়।

وَاِنَّ لَكُمۡ فِى الۡاَنۡعَامِ لَعِبۡرَةً ؕ نُسۡقِيۡكُمۡ مِّمَّا فِىۡ بُطُوۡنِهٖ مِنۡۢ بَيۡنِ فَرۡثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيۡنَ

❝ নিশ্চয়ই গবাদি পশুর ভেতর তোমাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার উপকরণ আছে। তার পেটে যে গোবর ও রক্ত আছে, তার মাঝখান থেকে আমি তোমাদেরকে এমন বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হয়ে থাকে। ❞ (সূরা আন নাহল, আয়াত ৬৬)

اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ

❝ তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। ❞ (সূরা আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭)

فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؕ خُلِقَ مِنۡ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ يَّخۡرُجُ مِنۡۢ بَيۡنِ الصُّلۡبِ وَالتَّرَآئِبِ

❝ সুতরাং মানুষ লক্ষ করুক তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি দ্বারা। যা পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী (অক্ষ) হতে নির্গত হয়। ❞ (সূরা আত্ব ত্বারিক্ব, আয়াত ৫-৭)

وَفِى الۡاَرۡضِ اٰيٰتٌ لِّلۡمُوۡقِنِيۡنَ ۙ وَفِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ ؕ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ

❝ যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে বহু নিদর্শন। এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পার না? ❞ (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ২০-২১)

➲ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে, "যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করবে, নিজের গ্রন্থিগুলির বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তাকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্যই।" (তাফসিরে ইবনে কাসির; তাফসিরে কুরতুবী ১৭/৪০)

একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মধুর ঔষধি গুণ উল্লেখ করেছেন এবং অতঃপর সেটাকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে রেখেছেন।

بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِيۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ

❝ (মৌমাছি)-এর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। ❞ (সূরা আন নাহল, আয়াত ৬৯)

সুতরাং, চিকিৎসাবিজ্ঞানে যেহেতু মানুষ (অথবা প্রাণী) এর দৈহিক গঠন এবং প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঔষধ সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণা করা হয়, তাই বলা যায় চিকিৎসাবিজ্ঞান আল্লাহর নিদর্শনকে বোঝার পথকে সহজ করে দেয়। আর এর দ্বারা চিকিৎসকগণ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হন।

➲ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “চিকিৎসকগণ এবং প্রকৌশলীরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমানদের মধ্যে পড়েন এবং তাদের চিকিৎসা ও গণিত-সংক্রান্ত শুদ্ধ জ্ঞানে পারদর্শিতা রয়েছে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ, ২/৩৪৪)

এছাড়া, হাদিসেও রাসুল ﷺ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরকে গবেষণা করতে উৎসাহিত করেছেন। রাসুল ﷺ এর সময়ে এমন অসংখ্য রোগ ছিলো যেগুলো তৎকালীন সময়ের হিসেবে অচিকিৎসাযোগ্য; তবুও তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে বার্ধক্য ব্যতীত সকল রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে, শুধু আবিষ্কার হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

➲ ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “নবী ﷺ-এর এই বাণী— ‘প্রত্যেক রোগেরই প্রতিকার আছে’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২০৪)—এতে রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের মনোবল শক্তিশালী হয় এবং সেই চিকিৎসা অনুসন্ধান ও তা খুঁজে বের করার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়।” (যাদুল মা'আদ, ৪/১৫)

➲ ইমাম আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “নবী ﷺ-এর এই বাণী— ‘আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার চিকিৎসাও তিনি অবতীর্ণ করেননি।’ (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬৭৮)।... — আমরা বলি এই হাদিস মানুষের উচ্চ মনোযোগকে চিকিৎসাবিদ্যার দিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং চিকিৎসা শেখার জন্য তাদের সংকল্পকে জাগ্রত করার দাবি করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চিকিৎসা একটি দক্ষতা।” (আত-তিব্বুন নববী, আয-যাহাবী, বৈরুত, পৃঃ ২২৮-২২৯)

➤ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “আল্লাহ যে কোন রোগ অবতীর্ণ করেছেন, তার সঙ্গে ঔষধও অবতীর্ণ করেছেন। যাকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেননি, সে অজ্ঞাত রয়েছে আর যাকে তিনি শিখিয়েছেন, সে অবগত হয়েছে।” (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদিস নং ৪৭; ইবনে হিব্বান রাহি. এর মতে সহীহ)

রাসুল ﷺ এর বহু হাদিসে, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান এবং তা থেকে অর্জিত উপকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যার ফলে, চিকিৎসাবিদ্যা ইলমে নাফি'আ বা উপকারী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী মর্যাদা অর্জন করে, যদি এর দ্বারা মানুষের উপকারের নিয়ত রাখা হয়। ইসলাম আমাদেরকে এসমস্ত উপকারী জ্ঞান অর্জন ও কামনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। কুরআন শরিফের প্রথম নির্দেশই ছিলো,

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ

❝ পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ❞ (সূরা আল আলাক, আয়াত ১)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করো এবং উপকারহীন জ্ঞান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৮৪৩; সহিহ)

➲ সৌদি আরবের সরকারি প্রতিষ্ঠান ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি উল্লেখ করেন, “প্রত্যেক দ্বীনি জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান অর্জনে সহায়ক উপায়সমূহ—এসবই সেই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা বৃদ্ধি করেন তাদের, যারা তা শিখে, তার উপর আমল করে এবং একনিষ্ঠভাবে তা তাঁর জন্য করে। আর এই জ্ঞানই (বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে ইলমের) মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত।

আর প্রত্যেক দুনিয়াবী জ্ঞান, যা উম্মাহর প্রয়োজন এবং যার উপর তাদের জীবন নির্ভরশীল, যেমন চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি—এসবও অন্তর্ভুক্ত (সওয়াবের মধ্যে), যদি নিয়ত ভালো হয়, এবং শিক্ষার্থী ও কর্মী এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর উপকার, তাদের শক্তি বৃদ্ধি, মর্যাদা উন্নয়ন এবং তাদেরকে কুফর ও ভ্রান্ত জাতির ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য রাখে। তবে এটি (ইলমের) মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং গৌণ (দ্বিতীয়) উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য হবে। এবং প্রতিটি জ্ঞানের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন হবে—দ্বীনের সাথে তার সম্পর্ক, উপকারের শক্তি এবং প্রয়োজন পূরণের মাত্রা অনুযায়ী।”
(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ, ১২/৭৭)

চিকিৎসা যে একটি উপকারী বিদ্যা তা সম্পর্কে জাতি, ধর্ম, মতবাদ নির্বিশেষে কোথাও কোনো দ্বিমত নেই। একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত চিকিৎসাবিদ্যার প্রায় পুরোটাই বৈধ ও কল্যাণকর। চিকিৎসার জ্ঞান মানুষের ইহলৌকিক কষ্টকে দূর করে যেভাবে দ্বীনের জ্ঞান মানুষের পরলৌকিক কষ্টকে দূর করে দেয়। চিকিৎসকরা মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখার জন্য কাজ করেন; যেভাবে ওলামাগণ মানুষের রুহকে সুস্থ রাখার জন্য কাজ করেন। এজন্যই, ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) চিকিৎসাবিদ্যাকে ইলমে দ্বীনের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলেছেন।

➲ ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, “আমি হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞানের (ইসলামি আইনবিজ্ঞান) পর চিকিৎসার চেয়ে অভিজাত কোনো বিদ্যা সম্পর্কে জানি না; তবে, আহলে কিতাবরা আমাদেরকে তাতে অতিক্রম করে ফেলেছে।” (সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১০/৫৭)

➲ ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ যখন দেখতেন মুসলিমরা চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে অবহেলা করছে তখন তিনি আফসোস করে বলতেন, “তারা জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট করে ফেলেছে এবং সেটাকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপর ছেড়ে দিয়েছে।” (প্রাগুক্ত)

➲ ইবন আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন, ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয়ই জ্ঞান কেবল দুই প্রকারঃ- দ্বীনের জ্ঞান এবং দুনিয়ার জ্ঞান। দ্বীনের জ্ঞান হলো ফিকহের (শরীয়তগত গভীর বোঝাপড়া) জ্ঞান অর্জন করা, আর দুনিয়ার জ্ঞান হলো চিকিৎসাবিদ্যা। এর বাইরে কবিতা ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা হয় কষ্টসাধ্য অনর্থক বিষয়, অথবা দোষের কারণ।... এমন কোনো ভূখণ্ডে বসবাস করো না, যেখানে তোমার দ্বীন সম্পর্কে জানানোর জন্য কোনো আলেম নেই, এবং তোমার দেহ সম্পর্কে জানানোর জন্য কোনো চিকিৎসক নেই।” (আদাব আল-শাফিঈ ওয়া মানাকিবুহ, ১/২৪৪)

সুতরাং, ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসাবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাময় একটি বিদ্যা। কেননা, এর মাধ্যমে যেভাবে আল্লাহর সৃষ্টিকে জানা যায়, সেভাবে মানুষ (ও অন্যান্য প্রাণীর) কষ্টও দূর করা হয় এবং সুস্থতার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামতের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। মানুষের পরকালের জন্য ইলমে দ্বীন যেমন আবশ্যক, ইহকালের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা তেমনই আবশ্যক।

❖ ফুটনোটঃ কুরআন ও হাদিসে জ্ঞান অর্জনের অসংখ্য ফজিলত ও বিধান বর্ণিত হয়েছে। ওলামাকে কেরামের ঐকমত্যে এগুলো সবই প্রাথমিকভাবে দ্বীনের জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “জ্ঞান তিন প্রকার। এগুলো ছাড়া যা আছে তা অতিরিক্ত।
১. মুহকাম আয়াতসমূহ (তাফসিরশাস্ত্র)
২. প্রতিষ্ঠিত হাদীস (হাদিসশাস্ত্র)
৩. ন্যায্যভাবে সম্পত্তি বন্টনের জ্ঞান (ফিকহশাস্ত্র)” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৮৮৫; যইফ)

সুতরাং, কুরআন-হাদিসে জ্ঞান অর্জনের যে বিশাল মর্যাদা ও প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দুনিয়াবি জ্ঞান প্রাথমিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। দুনিয়ার জ্ঞান হালালও হতে পারে; আবার হারামও হতে পারে। যেমনঃ- জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভাস্কর্যশিল্প, বাদ্যশিল্প প্রভৃতি জ্ঞান অর্জন হারাম, কেননা তা হারাম কাজ করার উদ্দেশ্যে শেখা হয়। এখন, হালাল জ্ঞানের মধ্যে অনেক জ্ঞান উপকারীও হতে পারে; আবার উপকারহীনও হতে পারে। যেমনঃ- ফিকশন, মাইথোলজি প্রভৃতি উপকারহীন হালাল জ্ঞান যার পিছনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে তা অপচয় হিসেবে গণ্য হবে। দুনিয়াবী জ্ঞানের মধ্য হতে যেসকল জ্ঞান হালাল ও মানুষের উপকার করতে পারে; শুধু সেইসকল জ্ঞান অর্জনই সওয়াবের কাজ হবে, যদি নিয়ত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপকার করা। যেমনঃ- চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, গবেষণা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান। ইলমে দ্বীনের পরে এগুলো তাদের উপকারী বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ফজিলত ও মর্যাদা অর্জন করবে।

ইলমে দ্বীন অর্জনের ফজিলত ও মর্যাদা যেকোনো দুনিয়াবী উপকারী জ্ঞানের থেকে বেশি। তবে, ইলমে দ্বীন অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অর্জন করতে হবে; ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে সেটা কবিরা গুনাহ হবে। অপরদিকে, দুনিয়াবী জ্ঞান মানুষের উপকারের নিয়তে শিখতে সওয়াবের কাজ হবে; কিন্তু, দুনিয়া অর্জনের নিয়ত নিয়ে পড়লে তা গুনাহের কাজ হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোন লোক যদি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৬৪; সহিহ)

⬛ চিকিৎসাক্ষেত্রে হালাল-হারাম

পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান বা ক্ষেত্র নেই যেখানে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান কার্যকর হয় না। ইসলামে সকল বিষয় সম্পর্কেই বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাক্ষেত্রও এর বাইরে নয়। তবে, এখানে মানুষের জীবন বিপন্ন হওয়া বা গুরুতর স্থায়ী ক্ষতির অবস্থা সৃষ্টি হলে ওজর সাপেক্ষে বেশকিছু হারাম জিনিস হালাল হয়ে যেতে পারে।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

❝ কিন্তু কেউ অবাধ্য কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❞ (সূরা আন নাহ্‌ল, আয়াত ১১৫)

নিচে, চিকিৎসাক্ষেত্রের কয়েকটি বিধানের মূলনীতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এগুলোর শাখাগত মাস'আলায় মতপার্থক্য রয়েছে বিধায় পাঠক যদি কোনো মাস''আলা বিস্তারিত জানতে চান তাহলে তার অনুসরণীয় ওলামাদের শরণাপন্ন হয়ে জেনে নিবেন।

১. হারাম ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা

একজন মুসলিম চিকিৎসকের কর্তব্য হলো যতক্ষণ পর্যন্ত বিকল্প হালাল ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম ঔষধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

➤ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, “আল্লাহ্ তা'আলা রোগও নাযিল করিয়াছেন এবং ঔষধও। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারিত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর; কিন্তু হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করিবে না।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদীস নং ৪৫৩৮)

➤ তারিক ইবনু সুওয়াইদ জুকী রাদিআল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি তাকে বারণ করলেন, কিংবা মদ প্রস্তুত করাকে খুব জঘন্য মনে করলেন।

তারিক রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, “আমি তো শুধু ঔষধ তৈরি করার জন্য মদ প্রস্তুত করি।”

রাসুল ﷺ বললেন, “এটি তো (ব্যাধি নিরামক) ঔষধ নয়, বরং এটি নিজেই ব্যাধি।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯৮৪; সহিহ)

২. সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি

চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যবহার করে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো অহেতুক বিকৃতি আনা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমনঃ- কসমেটিক সার্জারী, লিঙ্গ পরিবর্তন, স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ ইত্যাদি। তবে, যদি কোনো রোগ-ব্যধি বা শারীরিক ত্রুটি থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন করে মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক করা বিকৃতি হিসেবে গণ্য হবে না।

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

❝ (শয়তান বলল,) ‘আমি তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।’ ❞ (সূরা নিসা, আয়াত ১১৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ”আল্লাহ ঐসমস্ত নারীদের লা'নত করেছেন যারা অন্যের শরীরে উল্কি অঙ্কন করে, সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। (কেননা) তারা আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধন করে।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৮৮৬; সহিহ)

৩. মানবশরীরের সম্মান

আল্লাহ তায়ালা মানুষের শরীরকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। আর একজন শল্যচিকিৎসক যেহেতু মানুষের শরীর নিয়ে কাজ করেন তাই তাকে মানুষের শরীরের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। বিশেষ করে মানুষের অঙ্গ কেনা-বেচা করা এবং শরীরে অহেতুক কাটাছেড়া করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

❝ আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে এদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। ❞ (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ৭০)

➤ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা যেন তার জীবিতকালে হাড় ভাঙ্গার মতই।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২০৭; সহিহ)

৪. জীবনহানি

নরহত্যা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে একটি। চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যবহার করে এমন কোনো কাজ করা যাবে না; যার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মানুষের প্রাণহানি করা হয়। যেমনঃ- ইউথেনেজিয়া, চার মাস পরবর্তী পরিকল্পিত গর্ভপাত।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

❝ এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। ❞ (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ৩২)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আসমান-জমিনের মধ্যে বসবাসকারী সকলে একত্রে মিলিত হয়েও যদি একজন মু'মিনকে মেরে ফেলার কাজে শরীক থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৩৯৮; সহিহ)

৫. প্রতারণা

এছাড়া, চিকিৎসাবিদ্যা ব্যবহার করে কাউকে প্রতারণায় সাহায্য করা যাবে না। যেমনঃ- হাইমেনোপ্লাস্টি।

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৪৫২; সহিহ)

⬛ চিকিৎসার পূর্বে জ্ঞানার্জন

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

❝ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। ❞ (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ৩৬)

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا

❝ অথচ এই বিষয়ে এদের কোন জ্ঞান নেই, এরা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই। ❞ (সূরা আন-নাজ্‌ম, আয়াত ২৮)

ইসলামের একটি নির্দেশ হলো, যে বিষয়ে বান্দার যথেষ্ট জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দেওয়া। আর চিকিৎসাসেবা দেওয়া তো অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি কাজ যেখানে ভুল হলে অপূরণীয় ক্ষতি হতে যায়। এটি যে কেউ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন গভীর জ্ঞান ও মেধা। যারা চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ অধ্যায়ন করেছে এবং সমাজে চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, শুধু তাদেরকেই ইসলাম চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছে।

➤ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকের চিকিৎসা করে, অথচ সে চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত নয়, সে (রোগীর জন্য) দায়ী থাকবে।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪৮৩০; সহিহ)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যেসব ডাক্তার চিকিৎসা শাস্ত্র সর্ম্পকে জ্ঞান রাখে না, তারা যদি কোন গোত্রের চিকিৎসা করে এবং এর ফলে রোগীর ক্ষতি হয় তাহলে সে এজন্য দায়ী হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৫৮৭; সহিহ)

➤ সালমান ফারেসী রাদিআল্লাহু আনহু আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহুকে চিঠিতে লেখেন, "শুনতে পেলাম, তোমাকে ডাক্তার (বিচারপতি) নিযুক্ত করা হয়েছে এবং মানুষকে ঔষধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করে থাক, যদি তুমি চিকিৎসাশাস্ত্র শিখে তা করে থাক এবং এতে রোগ নিরাময় হয় তবে তা উত্তম, আর যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ না করে তুমি চিকিৎসক সেজে থাক তবে সাবধান ও সতর্ক হও- এমন না হয় যে, তোমার ভুল সিদ্ধান্তের দ্বারা মানুষকে মেরে ফেলবে, ফলে তুমি দোযখে প্রবেশ করবে।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, আল-হাদিস অ্যাপ, হাদিস নং ১৪৫৭)

➲ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "দ্বীন ও দুনিয়াকে চার ধরনের লোক ছাড়া আর কেউ এতটা নষ্ট করে নাঃ- অর্ধশিক্ষিত কালামবিদ (ধর্মতাত্ত্বিক), অর্ধশিক্ষিত ফকিহ, অর্ধশিক্ষিত ব্যাকরণবিদ এবং অর্ধশিক্ষিত চিকিৎসক।" (আল-ফাতাওয়া আল-হামাউইয়্যা আল-কুবরা, পৃঃ ৫৪৪)

উক্ত হাদিসগুলোতে কোয়াকদের প্রতি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। কোয়াকরা চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর পড়াশোনা না করে এবং বিনা স্বীকৃতিতে রোগীদেরকে ঔষধপত্র দিয়ে থাকে, যার দ্বারা রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর জন্য তাদেরকে গুনাহগার হতে হবে। আর যদি এসমস্ত কোয়াকরা নিজেদেরকে পূর্ণ স্বীকৃত চিকিৎসক হিসেবে দাবী করে তখন তো তারা মিথ্যা ও প্রতারণার গুনাহেও যুক্ত হলো।

অন্যদিকে, চিকিৎসাশাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জনকারী, স্বীকৃত ও বৈধ কোনো চিকিৎসক যদি সতর্কতা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো রোগীর অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণের সময় ইজতিহাদ (চিন্তা-গবেষণা/অনুধাবন) করতে গিয়ে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা এর জন্য তাকে পাকড়াও করবেন না।

➤ কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(বিচারকার্যে যোগ্যতাসম্পন্ন) কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর বিচারক ইজ্‌তিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭৩৫২; সহিহ)

➲ দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়াঃ- "আপনি (একজন ডাক্তার) যদি পূর্ণ সতর্কতা ও যত্নের সাথে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করার চেষ্টা করেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল করে ফেলেন যার ফলে রোগীর ক্ষতি হয়, তবে আপনি আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ হবেন না; শর্ত থাকে যে, আপনি একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক এবং কোনো মেডিকেল বিশেষজ্ঞের নিকট যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।" (দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ, প্রশ্নোত্তর আইডি ৮৭০)

সুতরাং, হাদিসে বর্ণিত সতর্কতার কথা মাথায় রেখে মেডিকেল, ডেন্টাল ও ভেটেরিনারি শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে এবং একজন পারদর্শী ডাক্তার হয়ে উঠতে হবে। তাহলে, ইনশাআল্লাহ তার সমস্ত পড়াশোনাই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সে যে কাজে অংশগ্রহণ করে, সেটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করে।

➤ নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ কোন কাজ করলে সে যেন তা নৈপুণ্যের সাথে করে।" (মুসনাদে আবূ ইয়্যা'লা, হাদিস নং ৪৩৮৬; সহীহুল জামে', হাদিস নং ১৮৮০; সিলসিলাহ সহীহাহ, হাদিস নং ১১১৩)

অপরদিকে যারা ডাক্তারী না পড়েও ডাক্তার সেজে থাকে, নিজেদের জ্ঞানের সীমার বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করে রোগীদের ক্ষতি করে তাদের উচিত তওবা করা।

⬛ চিকিৎসাবিদ্যা ফরজে কেফায়া

রাসুল ﷺ বহু হাদিসে মুসলিমদেরকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এসকল হাদিসের উপর আমল করা তখনই সম্ভব হবে যখন সমাজে চিকিৎসক বিদ্যমান থাকবে। যদি সমাজে কেউই চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন না করে তাহলে কেউই চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে রাসুল ﷺ এর নির্দেশ মানতে পারবে না এবং নিজের জীবনকেও রক্ষা করতে পারবে না, যেটা ফরজ। তাছাড়া, মুসলিম সমাজে কেউই চিকিৎসক না হলে মুসলিম সমাজ অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে, যেটা ইসলামের শান নয়।

➤রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "একজন মু'মিন ব্যক্তি অন্য মু'মিনের জন্য একটি সুদৃঢ় প্রাসাদস্বরূপ, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৯২৮; সহিহ)

এজন্য, উলামায়ে কেরাম চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনকে ফরজে কেফায়া বলেছেন। অর্থাৎ, চিকিৎসক হওয়া একটি মুসলিম গোষ্ঠীর উপর সমষ্টিগতভাবে ফরজ। যদি কিছু নির্দিষ্ট মানুষ পড়াশোনা করে চিকিৎসক হয় তাহলে পুরো গোষ্ঠীর ফরজ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু, যদি কেউই চিকিৎসক না হয় তাহলে সেই গোষ্ঠীর সকলেই দায়ী হবে।

➲ ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করা ফরজে কেফায়ার মধ্য থেকে, কেননা ঐ সমস্ত পেশা ও কাজ যা মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য, তা শিক্ষা ও চর্চা করা ফরজে কেফায়া, যেমন কৃষিকাজ। কাজেই চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিত ফরজে কেফায়া হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।" (রাওদাতুত-তালিবিন ওয়া উমদাতুল মুফতিয়্যিন, ১/৩২২)

➲ ইমাম গাজ্জালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ফরজে কিফায়া জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়, যা ছাড়া দুনিয়াবি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে চলতে পারে না। যেমন—চিকিৎসা, যা মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য; আর গণিত, যা ব্যবসায়িক লেনদেন, উত্তরাধিকার ও ওয়ারিশ বন্টন ইত্যাদির জন্য জরুরি। যদি কোনো সমাজে এই জ্ঞানসম্পন্ন কেউ না থাকে, তাহলে সমাজের মানুষ ক্ষতির মুখে পড়বে। তবে যদি একজন ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জন করে এবং তা কাজে লাগায়, তাহলে অন্যদের ওপর থেকে এই ফরজের দায়িত্ব উঠে যায়।

চিকিৎসা ও গণিতকে ফরজে কিফায়া বলা হলে যেন কেউ বিস্মিত না হয়। কারণ বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরি জ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোও ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত—যেমন কৃষিকাজ, বস্ত্র বয়ন, ঘোড়া প্রশিক্ষণ, এমনকি হিজামা (শিঙ্গা লাগানো) ও সেলাইয়ের কাজও। কোনো সমাজে যদি হিজামা জানা কেউ না থাকে, তাহলে খুব দ্রুত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং তারা নিজেরাই নিজেদেরকে রোগ ও মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করবে।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/১৬)

➲ কুয়েতি ফিকহ এনসাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে, "চিকিৎসা শিক্ষা করা ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। অতএব মুসলিমদের দেশে এমন লোক থাকা আবশ্যক, যে চিকিৎসা বিদ্যার মৌলিক নীতিমালা জানে। আর চিকিৎসা পেশা হিসেবে চর্চা করা—এর মূল বিধান হলো বৈধতা। এবং তা মুস্তাহাব হতে পারে, যদি এর সাথে নবী ﷺ-এর অনুসরণ করার নিয়ত যুক্ত হয় মানুষের চিকিৎসার দিকনির্দেশনায় অথবা মুসলিমদের উপকার করার নিয়ত করে।... তবে যদি অন্য কেউ না থাকার কারণে কোনো ব্যক্তি (চিকিৎসার জন্য) নির্দিষ্ট হয়ে যায় অথবা চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহলে তার চিকিৎসা চর্চা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।" (আল-মাওসুওয়াতুল ফিক্বহিয়্যা আল-কুয়েতিয়্যা, ১২/১৩৫)

➲ ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ফরজে কিফায়ার অর্থ হচ্ছে, প্রয়োজন পরিমাণ লোকে তা আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হবে, আর প্রয়োজন পরিমাণ লোকে আদায় করলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, শুরুতে ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব ফরজে আইনের মতো সকলের উপরই বর্তায়। তবে ব্যবধান হলো, কিছু সংখ্যক লোকের আদায়ের দ্বারা ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়, পক্ষান্তরে ফরজে আইন একজনের আদায়ের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব আদায় হয় না।" (আল-মুগনি, ৯/১৯৬)

সুতরাং, মানুষকে (বা প্রাণীকে) অসহায় মুহূর্তে সাহায্য করতে সমাজে কাউকে না কাউকে অবশ্যই চিকিৎসক হতে হবে। যদি নির্দিষ্ট কিছু মানুষ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তাদের দরুণ সকলেই গুনাহ থেকে সুরক্ষা পাবেন। আর যারা এই দায়িত্ব কাঁধে নিবেন তারাও ফরজে কেফায়া পূরণের ফজিলত পাবেন। উল্লেখ্য, চিকিৎসাবিদ্যার সাথে এর

আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি যেমন নার্সিং, ফার্মেসি, পাবলিক হেলথ, বায়ো-মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি ফরজে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি এগুলো ছাড়া চিকিৎসাব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে।

❖ ফুটনোটঃ ফরজে কেফায়া পূরণের পূর্ণ সওয়াব তখন পাওয়া যাবে যখন সমাজের কোনো নির্দিষ্ট আমলে অংশগ্রহণকারীদের অভাব থাকবে বা তৈরি হবে এবং সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে কেউ সেই আমলে অংশগ্রহণ করবে। WHO এর মতে কোনো জনগোষ্ঠীতে প্রতি ১০০০জনের জন্য অন্তত ১জন চিকিৎসক থাকা প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী বাংলাদেশে সার্বিকভাবে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে এবং কিছু অনুন্নত এলাকায় চিকিৎসকের অভাব মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। তাই, পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ করা এবং চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে, এদেশে নার্সদের চাহিদা আরো বেশি হওয়ায় নার্সিংবিদ্যা গ্রহণ করা এবং নার্স নিয়োগ দেওয়া আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ফরজে কিফায়া আমলে যদি পূর্ব থেকে চাহিদা বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেটি পালন করা অন্য যেকোনো নফল আমল পালন করার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ফরজে কিফায়া শুরুতে প্রত্যেকের উপরেই ফরজ হিসেবে আপতিত হয় এবং কেউ সেটা পালনে অগ্রসর না হলে সকলেই গুনাহগার হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ❝আমার বান্দা ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না।❞ (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৫০২; সহিহ) অর্থাৎ ফরজ ইবাদতই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

এছাড়া, বান্দা যখন কোনো একটি গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তখন আল্লাহ তার বিনিময়ে একটি সওয়াব লিখেন। রাসুল ﷺ তার প্রতিপালক হতে বর্ণনা করেন, "যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্‌ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৯১; সহিহ) সুতরাং, ফরজে কিফায়া পালনের মাধ্যমে যেহেতু পুরো একটি জনগোষ্ঠীকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা হয়, তাই তার জন্য সওয়াব কী পরিমাণ হবে— তা আল্লাহই ভালো জানেন।

⬛ রোগী দেখার ফজিলত

প্রত্যেক ব্যক্তিই অসহায় (vulnerable) অবস্থায় অন্যদের থেকে সহমর্মিতা-সহানুভূতি কামনা করে। কেননা, এটি তার মানসিক স্বস্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি একজন রোগী জানতে পারে যে কিছু মানুষ তার সুখ-দুঃখের ব্যাপারে পরোয়া করে তখন এই মানসিক সাপোর্টই তাকে সুস্থ হতে বেশি করে অনুপ্রাণিত করে; আর যদি তা না হয় তাহলে সে ভিতর থেকে ভেঙে পড়ে এবং আরো বেশি পীড়া ভোগ করে। আর এজন্য রাসুল ﷺ এর একটি বিশেষ সুন্নত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায় হলো কোনো মুসলিম রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং তার ভালো-মন্দ জানতে চাওয়া। হাদিসে এর অনেকগুলো ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

➤ নবী ﷺ বলেন, "তোমরা রুগ্নকে দেখতে যাও এবং জানাযার অনুসরণ করো। তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দিবে।" (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৫২০; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "কোন মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলিম রোগীকে সকাল বেলা দেখতে যায় তাহলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার (মাগফিরাতের) জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। সে যদি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা ভোর পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ফলের বাগান তৈরী হয়।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৯৬৯; সহিহ)

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি রোগীকে দেখতে গেলে আকাশ থেকে একজন আহবানকারী (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছো, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্ধারণ করে নিলে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৪৪৩; হাসান)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মুসলমান তার কোন (রুগ্ন) মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে সে (যতক্ষণ সেখানে থাকে ততক্ষণ) যেন জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৯৬৭; সহিহ)

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য রওয়ানা হয় তখন সে আল্লাহর রহমতের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে, যে পর্যন্ত রোগীর বাড়ি গিয়ে না পৌঁছে। আর বাড়ি পৌঁছানোর পর রহমতের সাগরে ডুব দেয়।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৮১; সহিহ)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কেউ উত্তমরূপে উযু করে নেকীর আশায় তার কোন (অসুস্থ) মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর খারীফ (সত্তর বছরের) পথ দূরে রাখা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩০৯৭; যইফ)

➤রাসুল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি রোগীর কাছে কুশল জানতে চায়, সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে থাকে।” (আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদিস নং ২০৬৪; ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান রাহিমাহুমাল্লাহর মতে সহীহ)

চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য উপরের হাদিসগুলো অনেক বড় সুসংবাদ। কেননা তাদের পুরো দিনই কেটে যায় রোগী দেখতে দেখতে। যার কারণে তারা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর রহমত, ফেরেশতাদের দোয়া এবং জান্নাতের অপেক্ষার মাঝে কাটানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। অন্যান্য খুব কম পেশায়ই আখিরাত গঠনের এত বড় সুযোগ রয়েছে। তবে, এই সুযোগ অর্জনের জন্য শুদ্ধ নিয়ত জরুরী।

➤ রাসুল ﷺ বলেন, “কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, “আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি (একনিষ্ঠ) আমল, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, ব্যতীত আর কিছুই কবুল করেন না।” (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৪০; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেহকায় ও বাহ্যিক আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৬৪; সহিহ)

কোনো রোগীকে কেউ দেখতে আসলে সে মানসিকভাবে অনেক শান্তি লাভ করে। তবে, একজন রোগী সবচেয়ে বেশি মানসিক শান্তি তখনই লাভ করে যখন তার চিকিৎসক বা নার্স তাকে দেখতে আসেন। কেননা, রোগীর জন্য নিছক সহমর্মিতার থেকে আরোগ্য লাভের আশা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, একজন রোগীকে স্রেফ দেখতে যাওয়ার ফজিলত যদি এত বেশি হয় তাহলে তাকে দেখে তার চিকিৎসা করার ফজিলত যে কত বেশি হবে তা চিন্তার বিষয়। হাদিসে কুদসী থেকে জানা যায়, রোগীর সেবার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহকে পাওয়া যায়।

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তা’আলা কিয়ামাতের দিনে বলবেন, ❝হে আদাম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি।❞

সে বলবে, “হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক।”

আল্লাহ বলবেন, ❝তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে।❞” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৬৯; সহিহ)

রোগীদের সেবা করার এই দায়িত্বে জড়িত থাকার কারণে অনেকসময় অনিচ্ছাকৃত স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, যখন নতুন কোনো রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন স্বাস্থ্যকর্মীরা সরাসরি রোগীদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে সবার প্রথমে আক্রান্ত হন। আর যেকোনো মহামারীর প্রথমদিকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে তুলনামূলক উচ্চ মৃত্যুহার দেখা যায়। যার ফলে স্বাস্থ্যকর্মীরা শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকেন।

➤ কেননা, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮৩০; সহিহ)

⬛ চিকিৎসা দেওয়ার ফজিলত

রোগাক্রান্ত বা পীড়িত অসহায় মানুষের কষ্ট দূর করার মাধ্যমই হলো চিকিৎসা। চিকিৎসা মানুষের অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা, যা পূরণ না হলে মানুষ যতই ধনবান হোক সে সুখী হতে পারে না। চিকিৎসকের অনেক বড় সৌভাগ্য যে তার হাতের মাধ্যমে এই মহান কাজ সম্পন্ন হয়। তিনি তার পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন এক

সুপারপাওয়ার অর্জন করেন যার মাধ্যমে তিনি সুপারহিরো হয়ে অসংখ্য মানুষের সাহায্য করতে পারেন। অন্য খুব কম পেশায় সরাসরি মানুষের এমন অপরিহার্য উপকার করার সুযোগ রয়েছে। অধিকাংশ পেশার কাজ ফলাফলের বিবেচনায় ভালো-মন্দ হতে পারে। কিন্তু, একজন চিকিৎসকের কাজ মাত্রই মহৎ কাজ এমনকি তার রোগী যদি কোনো মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হয় তবুও। আখিরাতে এই পেশার ওজন কত বেশি হবে সেটা নিচের হাদিসগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন।

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, রোগীর সেবা কর এবং কষ্টে পতিতকে উদ্ধার কর।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬৪৯; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি তার ভাইয়ের (কোনও) উপকার করতে পারে, সে যেন (তা) করে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২১৯৯; সহিহ)

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে লোক কোন ঈমানদারের দুনিয়া থেকে কোন বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসে তার থেকে বিপদ সরিয়ে দিবেন। যে লোক কোন দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন।... সে যতক্ষণ তার (মুসলিম) ভাই এর সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৯৯; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে, সেই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজ হল মুসলমানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করা, তার বিপদ দূর করা, তার ঋণ পরিশোধ করা, তার ক্ষুধা নিবারণ করা। কারো প্রয়োজন মেটাতে গমন করা, আমার এই মদীনার মসজিদে একমাস ই'তিকাফ করার চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয়।... যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মেটাতে তার সাথে যায়, এমন কি সে তা তার জন্য সম্পন্ন করে দেয়, যে দিন অন্যান্য লোকেরা (বিপদের প্রচণ্ডতায়) ফসকে যাবে, সে দিন আল্লাহ তার দুই কদমকে স্থির রাখবেন।" (আত তারগিব ওয়াত তারহীব, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদিস নং ৪০০৯; হাসান)

➤ অপর একটি বর্ণনায়, রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে অগ্রসর হয়, তা তার জন্য দশ বছর ই'তিকাফ করা অপেক্ষাও উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন ই'তিকাফ করবে, আল্লাহ্ তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিনটি পরিখা খনন করবেন না। আর এক একটি পরিখার দূরত্ব পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হবে।" (আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদিস নং ৩৯৯৫; হাকিম রহ. এর মত্র সহীহ, হাইসামী রহ. এর মতে হাসান এবং ইবনুল যাওজী রহ. এর মতে যইফ)

মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটে পতিত হয় তখন চিকিৎসক হয়ে ওঠে তাদের শেষ আশ্রয়। আল্লাহ তায়ালা চিকিৎসককে সেই জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়েছেন যার মাধ্যমে সে একটি মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। যদি কোনো চিকিৎসক একজন রোগীর জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হন, তাহলে কুরআনের ভাষায় তিনি যেন গোটা মানবতাকেই রক্ষা করে ফেললেন।

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

❝ আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। ❞ (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ৩২)

লক্ষণীয় যে আল্লাহ তায়ালা এখানে সরাসরি কোনো ইহলৌকিক বা পরলৌকিক পুরষ্কারের কথা উল্লেখ করেননি। কেননা, গোটা মানবজাতিকে রক্ষা করার পুরষ্কার আমাদের কল্পনারও অতীত।

অপরদিকে, মানবচিকিৎসকের পাশাপাশি পশুচিকিৎসকরাও সৎ নিয়তের দ্বারা অসংখ্য সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারবেন। কেননা, রাসুল ﷺ আমাদেরকে সর্বদাই পীড়িত পশুপাখির সেবা ও তাদের কষ্ট দূর করার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, যা পশুচিকিৎসকরা করে থাকেন।

➤ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তা'আলা তার আমল কবূল করলেন এবং আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন।"

সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে?"

তিনি বললেন, "প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই পূণ্য রয়েছে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৩৬৩; সহিহ)

মানুষের হোক বা প্রাণীর, একজন চিকিৎসক সেইসকল মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা সবচেয়ে বেশি দয়া দেখানোর সুযোগ পান; কেননা তিনি তার রোগীকে সবচেয়ে অসহায় মুহুর্তেই পান। এই সুযোগের সদ্ব্যাবহার করতে পারলে আশা করা যায়, তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দয়ার মাধ্যমে নাজাত পেতে পারবেন। কেননা, বান্দা মাখলুকের প্রতি যেমন ব্যবহার করে আল্লাহ তার প্রতি তেমনই ব্যবহার করেন।

هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ

❝ ইহসানের প্রতিদান ইহসান ছাড়া আর কী হতে পারে? ❞ (সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৬০)

➤ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা যমীনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রাহমান হতে উদগত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৯২৪; সহিহ)

⬛ সওয়াবে জারিয়া

কিছু কিছু আমল এমন রয়েছে যেগুলো দুনিয়াতে একবার করতে পারলে পরবর্তীতে কিছু না করলেও আমলনামায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সওয়াব লেখা অব্যাহত থাকে; এমনকি মৃত্যুর পরেও সওয়াবের ধারা চলতেই থাকে। আর চিকিৎসকদের কাজে এমন সওয়াবে জারিয়ার সুযোগ অনেক বেশি। কেননা, তারা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের উপকার করে থাকেন আর জ্ঞান খুব সহজেই দূর-দূরান্তে পৌছুতে থাকে।

একজন চিকিৎসক মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে নানা পরামর্শ-উপদেশ দিয়ে থাকেন, যেটা সত্তাগতভাবেই একটি নেক আমল।

➤ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ; দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ; দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ।"

সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য?"

তিনি বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল, মু'মিন বা মুসলিম নেতাগণ এবং সর্ব সাধারণের জন্য।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৪৪; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "সকল প্রকার ভাল কথাই এক একটি সাদাকা।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০৯; সহিহ)

চিকিৎসকের এই পরামর্শের সহায়তায়ই একজন রোগী তার স্বাস্থ্যকে পরিচর্যা করেন এবং শারীরিক ক্ষতি হতে নিজেকে হেফাজত করেন যেটা ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই, চিকিৎসক যেহেতু তার রোগীকে ইসলামের

একটি নির্দেশ মানতে সাহায্য করছেন; সেহেতু, যতক্ষণ রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চলে এই আমলটি করবে ততক্ষণ চিকিৎসকের আমলনামায়ও এর জন্য সওয়াব লেখা হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ

❝ সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। ❞ (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ২)

আবার, এমন অনেক রোগী থাকে যারা পূর্বে ইবাদতগুজার ছিলো। কিন্তু, অসুস্থতার কারণে এখন ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। একজন চিকিৎসক যদি এই নিয়তে এমন রোগীর চিকিৎসা করে দেন যে সে সুস্থ হয়ে পুনরায় আল্লাহর ইবাদত করবে; তাহলে পরবর্তীতে সেই রোগী আমল করে যেসকল সওয়াব অর্জন করবে তার সমপরিমাণ সওয়াব চিকিৎসকের আমলনামায়ও যুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

➤ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি কোন ভাল আমলের পথ প্রদর্শন করে, তার জন্যে ’আমলকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮৯৩; সহিহ)

তর্কসাপেক্ষে, দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতগুলো শাখা রয়েছে তার মধ্য হতে চিকিৎসাবিজ্ঞান সবচেয়ে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকার করে থাকে। আর এজন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে যদি কেউ কোনো অবদান (যেমনঃ- প্রচার, সংস্কার, উন্নতি, বিস্তৃতি, উদ্ভাবন ইত্যাদি) রাখতে পারে তাহলে এরদ্বারা মানবতা সরাসরি উপকৃত হবে। একজন চিকিৎসক দুনিয়ায় এমন কিছু আমল করে রেখে যেতে পারেন যার বদৌলতে মৃত্যুর পরেও তার আমল নামায় সওয়াব লেখা অব্যাহত থাকবে। যেমনঃ-

১. তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা করে এমন কোনো নতুন তথ্য-উপাত্ত আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে যেতে পারেন যা চিকিৎসাপদ্ধতিতে স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে; হোক সেটা খুবই ক্ষুদ্র পরিবর্তন। এটার ফলে, তার মৃত্যুর পরেও তার অবদানের কারণে মানুষ উপকৃত হবে।

➤ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি একটি উত্তম রীতির প্রচলন করল, তার জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পর এ উত্তম রীতির উপর যত আমল করা হবে, তার আমলনামায় এর সওয়াব লিখা হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রচলন বন্ধ না হবে। এবং যে ব্যক্তি একটি মন্দ রীতির প্রচলন করল, এ কাজ পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার আমলনামায় এর গুনাহ লিখা হতে থাকবে।” (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদীস নং ১৯১০; হাসান)

২. তিনি চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন বই-পুস্তক ও আর্টিকেল লিখতে পারেন অথবা ইন্টারনেটে তথ্যভিত্তিক কন্টেন্ট রেখে যেতে পারেন, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি নিজের মৃত্যুর পরেও মানুষকে পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করতে পারবেন।

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া।
১. সাদাকায়ে জারিয়াহ, (এমন দান যা থেকে মানুষ ক্রমাগত উপকৃত হয়)
২. এমন জ্ঞান যার দ্বারা উপকার হয় এবং
৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬৩১; সহিহ)

৩. তিনি নতুন শিক্ষার্থীদেরকে চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখানোর মহান কাজটি করতে পারেন। যার ফলে, এই শিক্ষার্থীরা যখন নতুন ডাক্তার হয়ে মানুষের উপকার করবে তখন তার জন্য তিনিও সওয়াব পাবেন। এছাড়া, তিনি যদি শিক্ষার্থীদের ভিতর আল্লাহর জন্য নিয়ত শুদ্ধ রেখে চিকিৎসা দেওয়ার মনোভব তৈরি করে দিতে পারেন; তাহলে শিক্ষার্থীরা যে সওয়াব পাবে তা তিনিও পাবেন।

➤ নবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়, সে তদনুসারে কর্ম সম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে, এতে কর্ম সম্পাদনকারীর পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৪০; হাসান)

⬛ ই’দাদ, জিহাদ ও শাহাদাত

আল্লাহর দ্বীনে একটি মহান আমল হলো জিহাদ তথা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করা। জিহাদের ফজিলত এত বেশি যে তা বর্ণনা করে শেষ করা কঠিন। জিহাদকে বলা হয় ইসলামের চূড়া। অনেক হাদিসে এটাকে ঈমানের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল বলা হয়েছে। এছাড়া, কেউ জিহাদে যেতে পারলে তার জন্য শাহাদাতের পথ খুলে যায়। আর শাহাদাত মানেই আল্লাহর প্রিয় ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে মৃত্যুবরণ। নিচে জিহাদ ও শাহাদাতের ব্যাপারে অল্প কয়েকটি আয়াত ও হাদিস বর্ণনা করা হলো।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

❝ মু’মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ❞ (সূরা আন নিসা, আয়াত ৯৫)

➤ রাসুলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বললেন, “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সর্বোত্তম আমল।” (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৫৭; সহিহ)

➤ জিজ্ঞেস করা হলো, “হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?”

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সেই মু’মিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।”

সাহাবীগণ বললেন, “অতঃপর কে?”

তিনি বললেন, “সেই মু’মিন আল্লাহ্‌র ভয়ে যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৮৬; সহিহ)

➤ এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ- এর নিকট এসে বলল, “আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়।”

তিনি বলেন, “আমি তা পাচ্ছি না। (অতঃপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ‘ইবাদত করবে এবং আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না (অর্থাৎ ইফতার করবে না)?”

ব্যক্তিটি বলল, “(অসম্ভব!) এটা কে পারবে?”

আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, “মুজাহিদের ঘোড়া রশির দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা হয়।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৮৫; সহিহ)

➤ আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহ্‌র কাছে তার সওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবেনা। একমাত্র শহীদ ব্যাতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হবার প্রতি আগ্রহী হবে।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯৫; সহিহ)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “শহীদের জন্য আল্লাহ তা’আলার নিকট ছয়টি পুরস্কার বা সুযোগ আছে।

১. তাঁর প্রথম রক্তবিন্দু পড়ার সাথে সাথে তাঁকে ক্ষমা করা হয়, তাঁকে তাঁর জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়,
২. কবরের আযাব হতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়,
৩. সে কঠিন ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে,
৪. তাঁর মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তাঁর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।
৫. তার সাথে টানা টানা আয়তলোচনা বাহাত্তরজন জান্নাতী হূরকে বিয়ে দেওয়া হবে এবং
৬. তাঁর সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তাঁর সুপারিশ ক্বূল করা হবে।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৬৩; হাসান)

জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস এর থেকে অনেক বেশি। সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে, এগুলো থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে জিহাদ আল্লাহর কাছে কত প্রিয় একটি আমল এবং শাহাদাত লাভ করা কত বড় একটি সৌভাগ্য। এজন্য, প্রত্যেক মুমিনের উচিত জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা-আকাঙ্খা রাখা আর আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি বেশি করে শহীদি মৃত্যু কামনা করা।

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন যদিও সে আপন শয্যায় ইন্তিকাল করে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯০৯; সহিহ)

➤ নাবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, সে জিহাদ করেনি এবং মনে জিহাদের আকাঙ্খাও রাখেনি, তবে সে মুনাফিক্বী অবস্থায় মারা গেলো।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫০২; সহিহ)

যদিও বর্তমানে আমাদের জন্য জিহাদে যাওয়ার সুযোগ নেই, তবে আমরা যদি জিহাদের নিয়ত রাখি তাহলে তার বিনিময়েও আমরা আল্লাহর পুরষ্কারের আশা রাখতে পারি। আর যে ব্যক্তি সত্যি সত্যিই জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে সে এর জন্য কিছু হলেও প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আর ইসলামের পরিভাষায় এটাকে বলে ই'দাদ যা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরজ।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

❝ এরা বের হতে ইচ্ছা করলে এরা নিশ্চয়ই এর জন্যে প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু এদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনঃপূত ছিল না। সুতরাং তিনি এদেরকে বিরত রাখেন এবং এদেরকে বলা হয়, 'যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাক।' ❞
(সূরা আত তাওবাহ্, আয়াত ৪৬)

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

❝ তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর মাধ্যমে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণপ্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ❞ (সূরা আল আনফাল, আয়াত ৬০)

সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও আরো অনেক উপায়ে ই'দাদ করা যায়। একজন মেডিকেল/নার্সিং স্টুডেন্ট বা প্রশিক্ষণরত চিকিৎসক/নার্স তার স্বাভাবিক পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই ই'দাদের এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কেননা, যুদ্ধক্ষেত্রে নার্স ও চিকিৎসকদের প্রয়োজনীতা অপরিসীম। যেহেতু, আহত যোদ্ধাদের জন্য সর্বক্ষণ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি প্রয়োজন। সাহাবীদের মধ্যে অনেকে এজন্য চিকিৎসক/নার্স হিসেবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন।

➤ উম্মু আতিয়্যাহ আল আনসারী রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের সওয়ারী ও মালপত্র রক্ষানাবেক্ষণের জন্য পশ্চাতে থাকতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশোনা করতাম।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৮৫৬; সহিহ)

➤ সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি ভালো করেই চিনি যে, উহূদ যুদ্ধের দিন কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখমন্ডল জখম করেছিলো, কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জখম ধুয়েছিল এবং তাতে ঔষুধ লাগিয়েছিল, কে ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন, কিসের দ্বারা জখমে প্রলেপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছিল। অতএব যিনি ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন তিনি হলেন আলী (রাদিআল্লাহু আনহু), যিনি জখমের চিকিৎসা করেছিলেন তিনি হলেন ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহু)। রক্ত বন্ধ না হলে তিনি তাঁর জন্য এক টুকরা পুরানো চাটাই পোড়ালেন এবং তার ছাই তাঁর জখমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন, ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলো।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৪৬৫; সহিহ)

নার্স/চিকিৎসকরা যোদ্ধাদেরকে শারীরিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেন, যার কারণে যুদ্ধের সওয়াব তারাও লাভ করেন। কেননা যুদ্ধের অন্যতম সরঞ্জাম হচ্ছে সুস্থতা ও শারীরিক সক্ষমতা, যা ব্যতীত যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন গাযীকে (যুদ্ধের) সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়, তার সেই গাযীর সমপরিমাণ সওয়াব হয় এবং এতে গাযীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হয় না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৭৫৯; সহিহ)

➤ নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জিহাদ করে না বা জিহাদকারীর সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয় না অথবা জিহাদকারী (যুদ্ধে) যাওয়ার পর তার পরিবার-পরিজনের উত্তমরূপে খোঁজ–খবর নেয় না, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বে ভীষণ বিপদে নিক্ষেপ করবেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৭৬২; হাসান)

অনুরূপভাবে পশুচিকিৎসকদের পড়াশোনাও ই'দাদের অংশ হতে পারে। পূর্বে যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহার হত; বর্তমানে ঘোড়ার ব্যবহার কম থাকলেও গোয়েন্দা কুকুরের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। তাই, পশুচিকিৎসকদেরও প্রয়োজন রয়েছে।

এভাবে, চিকিৎসকরা চাইলে তাদের দুনিয়াবী প্রশিক্ষণ বা পড়াশোনাকেই নিয়ত দ্বারা ই'দাদের মত বিশাল আমলে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারবেন। তাই প্রত্যেক হবু চিকিৎসকেরই অন্তর থেকে জিহাদ ও শাহাদাতের দৃঢ় সংকল্প রাখা উচিত এবং সেই লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

⬛ পরিবারের জন্য উপার্জন

অনেকে মনে করেন, মানবসেবা করার জন্য চিকিৎসকদের পুরোপুরিভাবে উপার্জন ছেড়ে দিয়ে বিনামূল্যে সবাইকে চিকিৎসা দিয়ে যেতে হবে। এটা সঠিক নয়। অবশ্য, চিকিৎসক যদি দয়াবশত বিনিময় ছাড়া কোনো রোগীর চিকিৎসা করেন তাহলে এটি তার জন্য অনেক বড় নেক আমল হবে এবং আল্লাহর নিকট তিনি এর জন্য যথোপযুক্ত প্রতিদান পাবেন ইনশাআল্লাহ— এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, নিয়ত ঠিক থাকলে তিনি বিনিময় নেওয়া সত্ত্বেও তার সেবা ইবাদত হিসেবেই গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

অনেক মুসলিম আছেন যারা দুনিয়া কামাইকে একেবারে খারাপ চোখে দেখেন। এটা বাড়াবাড়ি ব্যতীত কিছু নয়। ইসলাম কোনো বৈরাগ্যবাদী ধর্ম নয়। ইসলাম আমাদেরকে দুনিয়ার দৈনন্দিন জীবনের মধ্য থেকে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেই আল্লাহকে স্মরণ করতে শিখিয়েছে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

❝ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। ❞ (সূরা আল জুমুআহ, আয়াত ১০)

চিকিৎসক বা অন্য পেশাজীবীদের মধ্য হতে যারা পুরুষ, তাদের জন্য দুনিয়াবী উপার্জন ফরজ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, পুরুষদেরকে আল্লাহ তায়ালা পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যেভাবে নারীদেরকে ঘর ও সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, যতক্ষণ কোনো পুরুষ পরিবারের জন্য উপার্জনের নিয়তে বাইরে কাজ করবেন ততক্ষণ তিনি ইবাদতের মধ্যেই থাকবেন।

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

❝ জনকের (পুরুষের) কর্তব্য যথাবিধি তাদের (স্ত্রী ও সন্তানের) ভরণ-পোষণ করা। ❞ (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৩৩)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের দায়িত্বশীল, সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল; সে তাদের বিষয়ে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেসিত হবে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৫৫৪; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ ফয়সালা করেন, "ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) ঘরের দায়িত্ব পালন করবে এবং আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বাইরের দায়িত্ব পালন করবে।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদিস নং ২৯৬৭৭; যইফ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "(رجل তথা) পুরুষ মানুষের স্বোপার্জিত আয়-রোজগারের চেয়ে উত্তম আয়-রোজগার আর কিছুই নাই। কোন পুরুষ তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, তার সন্তানের জন্য এবং তার কর্মচারীর জন্য যা ব্যয় করে তা সাদাকাহ হিসাবে গণ্য হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২১৩৮; সহিহ)

ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিকভাবে অসহায় হয়ে পড়ে ভিক্ষাবৃত্তি করাকে অপছন্দ করে। যার কারণে ইসলাম উপার্জন করার তাগিদ দেয়। এছাড়া, পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয় করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। এটিকে অনেক হাদিসে সর্বোত্তম সাদাকাহ বলা হয়েছে। তবে এটি তখনই করা সম্ভব যখন একজন ব্যক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে উপার্জন করবে।

➤ এক সাহাবী তার সম্পদের বিপুল অংশ সাদাকাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলে রাসুল ﷺ তাকে বলেন, "তোমার ওয়ারিশদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাবার চেয়ে তাদের বিত্তবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৩৭৩; সহিহ)

➤ রসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, "একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার গোলাম আযাদ করার জন্য এবং একটি দীনার মিসকীনদেরকে দান করলে এবং আর একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে (সাওয়াবের দিক থেকে) ওই দীনারটিই উত্তম যা তুমি পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করলে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৯৯৪; সহিহ)

➤ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দাতার হাত হল উপরের হাত। আর (দান করা) শুরু করবে তোমার পোষ্যদের থেকে– (সবার প্রথমে) তোমার আম্মা, আব্বা, ভাই-বোন, তারপর ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটাত্মীয়, নিকটাত্মীয়।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ২৫৩২; সহিহ)

একজন চিকিৎসক বা অন্য যেকোনো পেশাজীবী যদি নিজের পরিবারের অভাব মেটানোর জন্য বা নিজেকে ভিক্ষাবৃত্তি হতে বাঁচানোর জন্য কষ্ট-সাধনা ও সংগ্রাম করে উপার্জন করেন তাহলে আল্লাহর নিকট তিনি আল্লাহর পথে জিহাদরত হিসেবে গণ্য হবেন। সুবহানাল্লাহ! কিন্তু, যারা মানুষের সাথে ধন-সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে উপার্জন করে, তারা এসকল ফজিলত পাবে না।

➤ রাসুল ﷺ এক লোককে দেখে বলেন, "সে যদি তার সন্তানদের জীবিকার জন্য বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পথে জিহাদেই রয়েছে। সে যদি তার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পথে জিহাদে রয়েছে এবং সে যদি নিজেকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে উপার্জনে বেরিয়ে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহর পথে জিহাদে রয়েছে। আর যদি সে লোক দেখানো ও অহংকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে শয়তানের পথে রয়েছে।" (আত-তারগিব ওয়াত-তারহীব, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদিস নং ২৬২০; সহিহ)

মহিলাদের জন্য ঘরের বাইরে বের হয়ে উপার্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয়। তবে, যদি তিনি ঘর, স্বামী ও সন্তানের প্রতি নিজের ফরজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ফ্রী-মিক্সিং এড়িয়ে পর্দার অনুসরণ করতে পারেন; তাহলে তাতে বাঁধাও নেই। অনেক নারী তো এমন পরিস্থিতিতে পড়েন যখন তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কোনো উপার্জনক্ষম মাহরাম থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে তিনি পরিবারের জন্য উপার্জনে নামলে ইনশাআল্লাহ অনেক সওয়াব অর্জন করতে পারবেন।

➤ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী রা'ঈতা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের হাতে বানানো জিনিসগুলো বিক্রি করে উপার্জন করতেন। তাঁর সমস্ত উপার্জন পরিবারের পেছনে ব্যয় হতো। যার ফলে তিনি অতিরিক্ত কিছু সাদকা করতে পারতেন না। এটা নিয়ে তাঁর আফসোস ছিলো।

একদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গিয়ে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন হস্ত-শিল্পী মহিলা, এর থেকে আমি বিক্রয় করি। আর আমার স্বামী-সন্তানের কোন সম্পদ নেই। তারা আমাকে (অভাবের কারণে) সাদাকা থেকে বিরত রেখেছেন, আমি সাদাকা করতে পারি না। (বলুন) তাদের জন্য যা খরচ করি তাতে আমার সাওয়াব হবে?”

রাসুল ﷺ বললেন, "এতে তোমার সাওয়াব রয়েছে, যা তুমি তাদের (তোমার পরিবারের) জন্য খরচ করছ। অতএব তুমি তাদের জন্য খরচ কর।” (ত্বহাবী শরিফ, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদিস নং ৩০২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৬০৮৬)

➤ যে নারী তার স্বামীর জন্য অর্থ ব্যয় করে তার ব্যাপারে নবী ﷺ বলেন, “তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়কে দেয়ার সওয়াব আর সদকা দেয়ার সওয়াব।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪৬৬; সহিহ)

যদি কোনো নারী চিকিৎসক পরিবারের জন্য উপার্জন করতে চান, তাহলে তার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো বাসার সাথেই প্রাইভেট চেম্বার/ক্লিনিক রেখে শুধু নারীদের চিকিৎসা দেওয়া অথবা ঘরে থেকে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া। এভাবে তিনি যেভাবে উপার্জন করলেন, সেভাবে ফ্রি-মিক্সিং থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন এবং ঘরে থাকার ফজিলতও অর্জন করলেন। কোনো নারী যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘরে থাকেন তাহলে তার আমলনামায় অনবরত সওয়াব লেখা হয়, কারণ তিনি তখন নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমলরত থাকেন।

وَقَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاہِلِیَّۃِ الۡاُوۡلٰی

❝ (হে নবীপত্নীগণ) আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। ❞ (আল আহযাব, আয়াত ৩৩)

তবে, একজন ডাক্তারের মন-মানসিকতা শুধু অর্থসম্পদ বা ব্যবসাকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়; বরং দ্বীনের খেদমত ও অসহায় মানুষকে সাহায্য করার নিয়তও অন্তরে রাখতে হবে। তবেই, তিনি সবদিক দিয়েই সার্থক হবেন। কখনো কখনো একজন ডাক্তারকে নিয়তের বিশুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে হতে পারে। যেমনঃ- অনেক ডাক্তার অভিযোগ করেন তারা কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম অনুযায়ী বিনিময় পান না— এক্ষেত্রে তাদের উচিত মানুষের উপকারের সুযোগ পাওয়াতে সন্তুষ্ট থাকা এবং অবশিষ্ট বিনিময় আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করা। মাঝেমধ্যে, ডাক্তার কোনো বিশেষ রোগীর উপর ইহসান করে নিজের অন্তরের পরিশুদ্ধতা যাচাই করতে পারেন।

⬛ চিকিৎসকের কষ্ট-সাধনা

বর্তমানে যতগুলো পেশা রয়েছে তার মধ্য হতে অন্যতম কঠিন পেশা হলো ডাক্তারী। একজন ডাক্তারের ছাত্রজীবনে যেভাবে থাকে পড়াশোনার সীমাহিন চাপ, কর্মজীবনে থাকে বিপুল কর্মভার আবার সবশেষে অবসর জীবনে এসে পেতে হয় মানুষদের থেকে 'কসাই-ডাকাত' উপাধি। অনেক ডাক্তার তাই বিষন্ন হয়ে জানতে চায়, এত কষ্টের বিনিময় কোথায়। দুনিয়া এই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও ইসলামে এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।

একজন চিকিৎসকের জীবনে যেসকল বিপদাপদ আসে সেগুলো তিনি নিজে থেকে ডেকে আনেন না। বরং সিস্টেমের কারণে সেগুলো তার ঘাড়ে এসে পড়ে। আর ইসলাম বলে মুমিনের উপর এসমস্ত আপতিত বিপদাপদ তার গুনাহগুলো দূর করতে সহায়ক হয়। যদি সে এসবে ধৈর্যধারণ করতে পারে তাহলে আল্লাহ তায়ালার সাথে তার সম্পর্ক হবে অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত দৃঢ়।

➤ নবী ﷺ বলেছেন, “মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকন্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।“ (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬৪১)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কিয়ামাত দিবসে বিপদে পতিত (ধৈর্যধারী) মানুষদের যখন প্রতিদান দেয়া হবে, তখন (পৃথিবীতে) বিপদমুক্ত মানুষেরা আকাঙ্ক্ষা (পরিতাপ) করবে, “হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হতো।”” (জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৪০২; হাসান)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “বিপদ যত তীব্র হবে, প্রতিদানও তদনুরূপ বিরাটপ হবে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষা করেন। যে কেউ তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে কেউ তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৩১; হাসান)

➤ এক সাহাবি রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়?”

রাসুল ﷺ বলেন, “নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সে মোতাবিক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না।” (জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৯৮; হাসান)

সুতরাং, এটা চিকিৎসকদের সৌভাগ্য যে সিস্টেম কর্তৃক তাদের উপর আপতিত বিপদাপদ সবচেয়ে বেশি। কেননা, এটা এই প্রমাণ করে যে আল্লাহ তায়ালা চিকিৎসকদের এই জামাতকে অনেক বেশি ভালোবাসেন এবং চিকিৎসকদেরকে তিনি পরিশুদ্ধ করতে চান। কেননা, যাদেরকে তিনি জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ দান করেছেন এবং যাদের হাতে তিনি অন্যদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার মহান দায়িত্ব সোপর্দ করে দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি গুনাহমুক্ত করে তার বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেন — এটাই স্বাভাবিক। আর কথায় আছে, আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। সুতরাং, ডাক্তারী পেশার এই ত্যাগ আফসোসের নয়, বরং গৌরবের। এসময় বিষন্ন হওয়া নয়, বরং উচিত ধৈর্য্যধারণ।

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ وَلَمَّا یَاۡتِکُمۡ مَّثَلُ الَّذِیۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِکُمۡ ؕ مَسَّتۡہُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُوۡا حَتّٰی یَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَہٗ مَتٰی نَصۡرُ اللّٰہِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰہِ قَرِیۡبٌ

❝ (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা জান্নাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের উপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, “আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?” মনে রেখ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। ❞ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২১৪)

তাছাড়া, আমরা জেনেছি চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াশোনা করা এবং চিকিৎসাসেবা প্রদান করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো ইবাদত করতে গিয়ে বান্দা যত কষ্ট সহ্য করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তত পুরষ্কার দিবেন।

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "এটি (ইবাদতের সওয়াব) হবে তোমার খরচ বা কষ্ট অনুপাতে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৭৮৭; সহিহ)

এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, বান্দা আখিরাত অর্জনের জন্য যেসকল ইফোর্ট দেয়, তার প্রত্যেকটির জন্য আল্লাহ তায়ালা বিনিময় নির্ধারিত করে রাখেন। তাই কোনো নেক কাজ যত বেশি কঠিন, তার জন্য যত বেশি ইফোর্ট প্রদান করতে হয়, তার জন্য সওয়াবও তত বেশি হয়।

وَمَنۡ اَرَادَ الۡاٰخِرَۃَ وَسَعٰی لَہَا سَعۡیَہَا وَہُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِکَ کَانَ سَعۡیُہُمۡ مَّشۡکُوۡرًا

❝ আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। ❞ (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ১৯)

فَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَہُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَا کُفۡرَانَ لِسَعۡیِہٖ ۚ وَاِنَّا لَہٗ کٰتِبُوۡنَ

❝ সুতরাং যদি কেউ মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আমি তো তা লিখে রাখি। ❞ (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৯৪)

দ্বিতীয়ত, এখানে সে ইবাদতের জন্য সওয়াব যেমন পাচ্ছে, তেমনই আপতিত কষ্টের উপর সবরের জন্য অতিরিক্ত সওয়াব পাচ্ছে। সুতরাং, শোকর আলহামদুলিল্লাহ যে ডাক্তারী পেশায় সবরের সুযোগ অনেক বেশি। অন্যান্য সহজ পেশাজীবিরা সৎ নিয়তের মাধ্যমে যে সওয়াব পাবে তা গণণাযোগ্য, কিন্তু ডাক্তাররা সৎ নিয়ত ও ধৈর্যের মাধ্যমে যে সওয়াব পাবে তা গণণার উর্ধ্বে।

اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَہُمۡ بِغَیۡرِ حِسَابٍ

❝ যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের সওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত। ❞ (সূরা আয্-যুমার, আয়াত ১০)

একজন চিকিৎসক তার জীবনে অবসর সময় খুব কম পান। তার জীবনের সিংহভাগ সময়ই কাটে চিকিৎসাবিদ্যার মত একটা মহান শাস্ত্র অধ্যায়ন এবং মানুষের কষ্ট দূর করার মত অর্থপূর্ণ কাজ করতে করতে। অবশিষ্ট যে স্বল্প সময়গুলো তারা পান, সেগুলোকে খুব সতর্কতার সাথে ভেবেচিন্তে ব্যয় করতে হয়। যার কারণে অন্যদের তুলনায় চিকিৎসকদের অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। এটাও একটা ফজিলত কেননা, চিকিৎসকদের জন্য নিচের আয়াত ও হাদিসের উপর আমল করা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ।

وَالَّذِیۡنَ ہُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَ

❝ (মুমিন তারাই) যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। ❞ (সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত ৩)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩১৮; সহিহ)

চিকিৎসকরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পান না বলে আফসোস করেন। কিন্তু, বর্তমান যুগের অধিকাংশ অনুষ্ঠান-প্রোগ্রামই হয়ে ওঠে ফিতনা ও গুনাহের আখড়া। তাই, চিকিৎসকদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে এই ব্যস্ত পেশার অজুহাতে তারা নিজেদেরকে এসমস্ত স্থানে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেন।

চিকিৎসকদের আরো একটা অভিযোগ থাকে যে, চিকিৎসাক্ষেত্র তাদের জীবনের Prime Time তথা যৌবনকালকে ছিনিয়ে নেয়। যৌবনে তারা পড়াশুনা ও চিকিৎসাকর্ম ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু করার সুযোগ পান না। কিন্তু, যৌবনে যেহেতু মানুষের প্রাণশক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে; সেহেতু বুদ্ধিমানের কাজ তো এটাই যে এই যৌবনকে উপকারী জ্ঞান অর্জন এবং মানুষের কষ্ট দূর করার মত মহান ইবাদতে ব্যয় করা। তাই চিকিৎসাক্ষেত্রে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে উৎসর্গ করা— কোনো অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ। যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ সবাইকে যৌবন সম্পর্কে প্রশ্ন

করবেন তখন মুখলেস চিকিৎসকরা উত্তর দিতে সমর্থ হবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর আরশের ছায়াও বরাদ্দ থাকবে। এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

➤ রাসুল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না।... (তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন করা হবে) তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে সে তা ব্যয় করেছে।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৪১৬; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবেনা, সেদিন আল্লাহ তায়ালা ৭ (শ্রেণির) ব্যক্তিকে তাঁর নিজের (আরশের) ছায়া প্রদান করবেন।.... (তন্মধ্যে থাকবে) সেই যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্য দিয়ে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৬০)

তাই, চিকিৎসকদের উচিত অহেতুক নেগেটিভ চিন্তা না এনে মন দিয়ে নিজের কাজ করে যাওয়া এবং ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর ভরসা রাখা। কষ্ট শেষে স্বস্তি অবশ্যই আসবে; হয় এই জগতে নয় ঐ জগতে।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا

❝ এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। ❞ (সূরা আত ত্বালাক, আয়াত ৩)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

❝ কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে। ❞ (সূরা আল ইনশিরাহ, আয়াত ৫-৬)

মানুষ যেপরিমাণ কষ্ট-পরিশ্রম করে, কষ্ট শেষে সে সেই পরিমাণই স্বস্তি অর্জন করে। এজন্য দেখা যায়, একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট প্রফ পাশ করে যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করে; একজন ভার্সিটি স্টুডেন্ট সেমিস্টার পাশ করে সেই পরিমাণ আনন্দ পায় না। একজন চিকিৎসক একদিন অতিরিক্ত ছুটিকে যেভাবে কাজে লাগাতে পারে; কোনো সহজ পেশাজীবী সেপরিমাণ সেটাকে কাজে লাগাতে পারে না। সুতরাং, কষ্ট করা, কষ্ট পাওয়া, চাপের মধ্যে থাকা — এগুলোও একপ্রকার আল্লাহর রহমত; কেননা এগুলো সুসময়ের মূল্য অনুধাবন করতে শেখায়।

সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আরেকটি সুবিধা হলো এতে মানুষের সহ্যক্ষমতা ও কর্মসামর্থ্য বৃদ্ধি করে। কেননা, ক্রমাগত মানুষের এসবের সম্মুখীন হলে তার শরীর ও মন ঠিকই অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে যেয়ে এগুলো তার কাছে সহজ মনে হয়। নিজেকে সীমার ওপারে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমেই মানুষ নিজের ট্রু পটেনশিয়ালকে আবিষ্কার করে। তাই doctorhood কে নিজেকে শক্তিশালী বানানোর প্রশিক্ষণক্ষেত্র মনে করা উচিত।

⬛ অস্থির জনতার মাঝে চিকিৎসক

স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য, একজন চিকিৎসককে সকল প্রকার জনগণের সাথে মিশে চলতে হয়। আর এমন অসংখ্য রোগীর পরিবার থাকে যারা ডাক্তারদের সম্মান বোঝে না। এজন্য, কর্মক্ষেত্রে ডাক্তাররা বিভিন্নভাবে জনগণের আচরণ, কথা ও কাজ দ্বারা আঘাত পেয়ে থাকেন এবং সব চুপচাপ সহ্য করেন। যার ফলে, নিম্নোক্ত হাদিসের ফজিলত তাদের উপর প্রযোজ্য হয়।

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মুমিন ব্যাক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারন করে সে এমন মুমিন ব্যাক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগনের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারন করে না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৩২; সহিহ)

ডাক্তারী পেশার একটি ফজিলত এটাও যে এখানে জনগণের সাথে মিশে চলে তাদের দুর্ব্যবহারের উপর ধৈর্য্যধারণ করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, একজন চিকিৎসক যখন প্রতিবার কোনো রোগী বা তার পরিবার কর্তৃক উত্যক্ত হন এবং তা সত্ত্বেও রোগীর ক্ষতি বা সেবা প্রদানে ত্রুটি করা হতে বিরত থাকেন, ততবার তিনি জান্নাতের হুরের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

➤ নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে কার্যে পরিনত করার ক্ষমতা রেখেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং জান্নাতের যে কোন হূর নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দান করবেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪১৮৬; হাসান)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪১৮৯; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে অথচ ইচ্ছে করলে সে তার ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" (আত-তারগিব ওয়াত-তারহীব, মুসলিম বাংলা অ্যাপ, হাদিস নং ৪০০৯; হাসান)

অস্থির ভীড়ের উৎপাৎ সহ্য করার ক্ষেত্রে জরুরী বিভাগের চিকিৎসকরাই সবচেয়ে এগিয়ে থাকেন। মানুষদের জীবন রক্ষার জন্য তাদের এই কাজ যেমনই মহান ঠিক তেমনই ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। অনেকসময় এমন জাহেল রোগীর পরিবার দেখা যায় যারা উত্তেজনা ও আবেগের বশে চিকিৎসককেই অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে বশে।

এরূপ অবস্থার শিকার হয়ে যদি কোনো চিকিৎসক মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তিনি শহীদী মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কেননা, এখানে তিনি নিজের সম্পদ তথা ডাক্তারী পেশা এবং তার ও তার পরিবারের রিযক রক্ষার জন্য কাজ করছেন। তাছাড়া, পরিবারের জন্য উপার্জন করাকে সহিহ হাদিসে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, কেউ যদি স্রেফ ডাক্তার হওয়ার কারণে বিনা-অপরাধে মব জুলুমের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে শহীদি মর্যায়ায় অধিষ্ঠিত করবেন। তবে, এরূপ আক্রমণের শিকার হলে ডাক্তারের কর্তব্য নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা।

➤ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে লোক নিজের ধনমাল রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ। যে লোক নিজের দীনকে হিফাযাত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে লোক নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ। যে লোক তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে মারা যায় সেও শহীদ।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৪২১; সহিহ)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যুলুমের (শিকার হওয়ার) কারণে মারা যায়, সে শহীদ।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪০৯৩; সহিহ)

আর যারা এরূপ ঘটনায় উপস্থিত থাকেন, তাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে তা প্রতিহত করা; তা সম্ভব না হলে মৌখিকভাবে নিন্দা জানানো ও প্রতিবাদ করা; তাও সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে অন্তর থেকে ঘৃণা জ্ঞাপন করা। কেউ যদি এরূপ অন্যায়ের প্রতি বিরোধিতা পোষণ না করে বরং অন্যায় করে সমর্থন করে তাহলে তিনি অন্যায়কারীর গুনাহের ভাগিদার হবেন।

➤ নবী (ﷺ) বলেছেন, "কোন স্থানে যখন অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হলে, সে অনুপস্থিতদের মতোই গণ্য হবে (তার গুনাহ হবে না)। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের স্থান থেকে অনুপস্থিত হয়েও তাতে সন্তুষ্ট হয়, সে অন্যায়ে উপস্থিতদের অন্তর্ভূক্ত (অর্থাৎ অন্যায়কারীদের মত সেও গুনাহগার হবে) ।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৫; সহিহ)

➤ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে এবং তার দৈহিক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন তা সেভাবেই প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের কথা দ্বারা তা

প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মনে মনে ঘৃণা করে। আর এটাই হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০১৩; সহিহ)

চিকিৎসকরা মানুষের দুর্ব্যবহারে কষ্ট বেশি পান কারণ তারা আর্তমানবতার সেবার জন্য গোটা জীবনজুড়ে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা করেন, তার বিনিময়ে তারা মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা আশা করেন। একারণে তারা যখন অকৃতজ্ঞ ও ডাক্তারবিদ্বেষী মানুষদের মুখোমুখি হন, তখন বিষন্ন হয়ে পড়েন। সুতরাং, মানুষের থেকে কখনো কোনো প্রতিদান আশা করা উচিত নয়; দোয়া, সম্মান, কৃতজ্ঞতা, স্বীকৃতি, ভালোবাসা কিছুই নয়। প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশা করা উচিত।

اِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ اللّٰهِ لَا نُرِیۡدُ مِنۡكُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوۡرًا

❝ (আল্লাহর প্রিয় বান্দারা বলে,) ‘কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।’ ❞ (সূরা আল-ইনসান, আয়াত ৯)

অনেকসময় যারা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তারা স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রের জটিলতা, স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবনের পরিশ্রম, মেডিকেল সাইন্সের বাস্তবতা প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং তাদের আবেগ বিভিন্ন গুজব-অপবাদ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার ত্রুটি দ্বারা প্রভাবিত থাকে। স্বাস্থ্যকর্মীদের উচিত এসমস্ত মানুষদেরকে এড়িয়ে চলা এবং নিজের মানসিক স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা। কেননা এদের থেকে বিষ গ্রহণ করলে তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হবে যারা এদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَ عِبَادُ الرَّحۡمٰنِ الَّذِیۡنَ یَمۡشُوۡنَ عَلَی الۡاَرۡضِ هَوۡنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الۡجٰهِلُوۡنَ قَالُوۡا سَلٰمًا

❝ ‘রহমান’-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, ‘সালাম’। ❞ (সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৬৩)

خُذِ الۡعَفۡوَ وَ اۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ

❝ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও আর অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল। ❞ (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

یُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ لَا یَخَافُوۡنَ لَوۡمَۃَ لَآئِمٍ

❝ তারা (আল্লাহর প্রিয় বান্দারা) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনও নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। ❞ (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৫৪)

⬛ চিকিৎসকের মানবীয় সীমাবদ্ধতা

চিকিৎসা স্রেফ একটি সেবা ব্যতীত কিছু নয়। আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালা জগতে যেসকল উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছেন সেগুলো সংগ্রহ করার নামই হলো চিকিৎসা। কিন্তু, চিকিৎসা করার অর্থ এই নয় যে আরোগ্য লাভ সুনিশ্চিত। কেননা, আরোগ্য পাওয়া বা না পাওয়া এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

وَ اِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ یَشۡفِیۡنِ

❝ যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। ❞ (সূরা আশ শুআরা', আয়াত ৮০)

➲ ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “একটি ইসরাঈলি বর্ণনায় এসেছে যে,
খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ থেকে?”

আল্লাহ বললেন, ❝আমার পক্ষ থেকে।❞

তিনি বললেন, "তাহলে ওষুধ কার পক্ষ থেকে?"

আল্লাহ বললেন, ❝আমার পক্ষ থেকেই।❞

তিনি বললেন, "তাহলে চিকিৎসকের কাজ কী?"

আল্লাহ বললেন, ❝সে এমন এক ব্যক্তি, যার হাতের মাধ্যমে আমি ওষুধ পাঠাই।❞" (যা'দুল মা'আদ, ৪/১৫-১৬)

একজন চিকিৎসকের কাজ হলো নিজের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে রোগীকে সুস্থ করে তোলার যথাযথ জাগতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা। কিন্তু সেই প্রয়োগকৃত পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকসময় চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। যদি কোনো চিকিৎসক তার দায়িত্বে অবহেলা করার দরুণ রোগীকে ভুল চিকিৎসা দেন — তাহলে অবশ্যই তিনি এখানে অপরাধী। কিন্তু, অনেকসময় এমন হয় যে চিকিৎসক সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা সত্ত্বেও রোগী আরোগ্য লাভ করে না। এজন্য, চিকিৎসককে দোষারোপ করা অজ্ঞতার পরিচয়।

➤ নবী ﷺ এক অসুস্থ সাহাবির ব্যাপারে বলেন, "আবূ উমামার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

অতঃপর তিনি নিজ হাতে তাকে তপ্ত লোহার দ্বারা সেঁক দিলেন। তিনি ইন্তিকাল করলে নবী ﷺ বলেন, "তার মৃত্যুতে ইহূদীদের খারাপ অপবাদ হস্তগত হলো। তারা বলবে, সে তার সাথীর মৃত্যু ঠেকাতে পারলো না; অথচ আমি নিজের জন্য অথবা কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখি না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৪৯২; হাসান)

সুতরাং, কোনো চিকিৎসা ব্যর্থ হলে সেটার দোষ চিকিৎসকের উপরে চাপানোর আগে ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে বিচার করা উচিত যে চিকিৎসকের পক্ষ হতে আদৌ কোনো ত্রুটি (অজ্ঞতা সত্ত্বেও দায়িত্ব গ্রহণ, চিকিৎসার ধাপ অনুসরণে অবহেলা) ছিলো কিনা। অন্যথায় সেটা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে আর অপবাদের শাস্তি ভয়ংকর।

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মিথ্যা মামলা দেয়, সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করাবেন। অতএব তাকে শিঘ্রই তার কথা হতে তাওবাহ এবং ত্যাগ করা উচিত।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৫৯৭; সহিহ)

একজন চিকিৎসক কোনো দেবতা বা ফেরেশতা নন; তিনি একজন মানুষ। সুতরাং, মানুষ হিসেবে তার নিজের কিছু সীমাবদ্ধতা বা ওজর থাকা অস্বাভাবিক নয়। কখনো কখনো চিকিৎসাসেবা প্রদান করে যাওয়া তার সাধ্যের বাইরে চলে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় তিনি যদি বৈধভাবে চিকিৎসাসেবা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন তাহলে তাকে দোষারোপ করা অনুচিত। কেননা,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

❝আল্লাহ কারও ওপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।❞ (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৮৬)

অনেক সময় চিকিৎসকগণ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক ঘটনার কারণে অনিরাপদবোধ করেন। এসময় যদি তারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য কর্মবিরতিতে যান তাহলে সেই অধিকার তাদের রয়েছে। কেননা, ইসলামে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে অন্যের জীবন বাঁচানো বাধ্যতামূলক নয়।

➲ ইমাম শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিঃসন্দেহে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সামর্থবান ব্যক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব (অবশ্যপালনীয়) এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উদ্ধার করতে গিয়ে যদি আশঙ্কা থাকে যে, ডুবন্ত ব্যক্তি তাকে

জাপটে ধরবে এবং সেও তার মতোই ডুবে মরবে তাহলে এই অবস্থায় তার জন্য এটি ওয়াজিব নয়-শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও নয় বা জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারেও নয়। এই অবস্থায় সে তাকে ছেড়ে নিজেকে রক্ষা করবে। চাই তার বাঁচার সম্ভাবনা থাকুক অথবা না থাকুক। বরং মহান আল্লাহর বাণীঃ-

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

❝আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।❞ (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৫)

এর প্রকাশ্য অর্থ এটাই যে, ডুবন্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে নিজেকে রক্ষা করা তার জন্য ওয়াজিব।" (আস সাইলুল জাররার,পৃষ্ঠা নং ৮৯২)

⬛ চিকিৎসকের পারিশ্রমিক

এমন অনেকে আছেন যাদের কাছে চিকিৎসকের পারিশ্রমিক নেওয়ার বিষয়টা অমানবিক ও অনৈতিক মনে হয়। যেহেতু মানুষ অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চিকিৎসকের দারস্থ হন; সেহেতু, সেঅবস্থায় 'চিকিৎসকের বিনিময় দাবী করা' একটুখানি অন্যায় দাবী মনে হতে পারে। কিন্তু এরূপ চিন্তাভাবনা চিকিৎসাসেবা সম্পর্কে বিভ্রান্তির পরিচয়।

একজন চিকিৎসক অত্যন্ত পরিশ্রম করে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়ন সম্পূর্ণ করেন এবং কর্মক্ষেত্রে এসে নিজের মহামূল্যবান সময় ব্যয় করে রোগীদের সেবা দিয়ে থাকেন। সুতরাং, এই কাজের জন্য তার বিনিময় দাবী করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সবার মত চিকিৎসকেরও হালালভাবে উপার্জন করার প্রয়োজন রয়েছে, যা তিনি মানবতার খাতিরে উৎসর্গ করতে বাধ্য নন।

➤ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "নবী ﷺ (চিকিৎসার জন্য) শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগিয়ে দেয় তাকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন আর তিনি নাকে ঔষধ টেনে নিয়েছেন।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬৯১; সহিহ)

➤ আবু সাইদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

কোন এক আরব গোত্রের অঞ্চল দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একদল সাহাবী পথ চলছিলেন। তারা তাদেরকে অতিথিসেবা করল না। ঘটনাক্রমে তাদের বংশের প্রধান ব্যক্তিটি অসুস্থ হয়ে যায়। তারা আমাদের (সাহাবিদের) নিকট এসে বলে, "তোমাদের নিকট কি কোন ঔষধ আছে?"

আমরা বললাম, "হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তোমরা তো আমাদের মেহমানদারী করনি। অতএব, যে পর্যন্ত তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক ঠিক না করবে আমরা চিকিৎসা করব না।"

অতঃপর আমাদেরকে একপাল ছাগল প্রদান করতে তারা রাজি হলো। আমাদের মধ্যেকার একজন সূরা ফাতিহা দ্বারা তাকে ঝাড়ফুঁক করল। ফলে সে রোগমুক্ত হয়ে গেল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাকে খুলে বললাম। তিনি বললেন, "তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে, এর মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা যায়?... এগুলো (ছাগলগুলো) তোমরা ভাগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ রাখ।"

বর্ণনাকারী এই (চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবীর) বিষয়ে তাঁর পক্ষ হতে কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেননি। (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২০৬৪; সহিহ)

সুতরাং, রোগীর চিকিৎসার বিনিময়ে একজন চিকিৎসকের পারিশ্রমিক নেওয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায্য দাবী। যারা স্রেফ পারিশ্রমিক দাবী করার জন্য চিকিৎসকদেরকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং রাকিদেরকে ধর্মব্যবসায়ী উপাধি দেন, তারা কি সাহাবিদের ব্যাপারেও একই কথা বলবেন? (নাউজুবিল্লাহ!)

অনেক চিকিৎসক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে তাদের অধিকার রয়েছে কাজের পূর্বে পারস্পারিক সন্তুষ্টি অনুযায়ী মজুরী নির্ধারিত করে নেওয়া এবং কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে চুক্তি মোতাবেক নিজেদের নির্ধারিত মজুরী আদায় করে নেওয়া। এখানে তাদের জন্য শ্রমিকের সকল অধিকার প্রযোজ্য হচ্ছে।

➤ আবু সাইদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "যখন তুমি কোন শ্রমিকের দ্বারা পরিশ্রম করাতে ইচ্ছা করবে, তখন তার পারিশ্রমিক ঠিক করে নিবে।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩৮৫৭; সহিহ)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৪৪৩; সহিহ)

➤ নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, ❝ কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না। ❞" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২২২৭; সহিহ)

অনেক চিকিৎসক প্রাইভেট প্রাক্টিস তথা ব্যক্তিগত চেম্বার/ক্লিনিক ব্যবসা করে থাকেন, যেখানে তিনি তার সেবার মূল্য নির্ধারণ করে সেটা বিক্রয় করে মানুষের থেকে অর্থ নিয়ে থাকেন। অনেকে মনে করেন, সকল চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্রাক্টিসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট ও সীমিত মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত — যেটা ইসলাম ও চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা ব্যতীত কিছু নয়। ইসলামী অর্থনীতিতে কোনো পণ্য বা সেবার মূল্য ভোক্তার চাহিদা, বাজারের প্রতিযোগিতা ও ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পারিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

❝ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। তবে পরস্পর সন্তুষ্টি চিত্তে ব্যবসার মাধ্যমে ভোগ করতে পারো। ❞ (সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ২৯)

➤ লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। আপনি আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহই মূল্যের গতি নির্ধারণকারী, তিনিই তা কমান ও বৃদ্ধি করেন এবং একমাত্র তিনিই রিযিক্বদাতা। আমি এই আশা করি যে, আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো যেন আমার উপর কারো জীবন বা সম্পদের উপর জুলুম করার কোনরূপ অভিযোগ না থাকে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৪৫১; সহিহ)

➲ আল্লামা মারগীনানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া উচিত না।... কেননা মূল্য হলো চুক্তিকারীর অধিকার। সুতরাং তা নির্ধারণের অধিকার তারই।" (হেদায়া মাআ ফাতহুল কাদীর, ৪/৩৭৭)

➲ দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়াঃ- "ক্রেতা-বিক্রেতা মিথ্যা এবং প্রতারণা না করে পরস্পর সন্তুষ্টি চিত্তে যে মূল্য নির্ধারণ পূর্বক লেনদেন করবে তা বৈধ রয়েছে। চাই তাতে লাভের পরিমাণ যত বেশি হোক না কেন। কিন্তু 'গবনে ফাহেশ' (অর্থাৎ এমন মূল্যে লেনদেন করা যে মূল্য কোন বাজার নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়) এ লেনদেন করাকে অনুচিত এবং মানবিকতার বিরোধী মনে করেন।" (ফতোয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, ফতোয়া নং ১৬৯৯৪৩)

সুতরাং, একজন রোগীর যেমন অধিকার রয়েছে বাজেট অনুযায়ী তার পছন্দমত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার; ঠিক একইভাবে চিকিৎসকেরও অধিকার রয়েছে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ফী নির্ধারণ করার। যখন উভয়েই পরস্পরের চুক্তিতে সন্তুষ্ট হবে তখন সেবা আদান-প্রদান হবে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীকে বাধ্য করতে পারে না নির্দিষ্টভাবে শুধু তার কাছে আসার জন্য; একইভাবে, রোগী চিকিৎসককে বাধ্য করতে পারে না মূল্য কমিয়ে তাকে সেবা দেওয়ার জন্য। যদি কেউ মহানুভবতা প্রদর্শন করে ছাড় দেয়, তাহলে উত্তম; কিন্তু, ছাড় দেওয়ার জন্য বাধ্য করার অধিকার অপরপক্ষের নেই।

এছাড়া, সরকার যদি সকল চিকিৎসকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেন তাহলে চিকিৎসাসেবায়ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। কেননা একজন চিকিৎসক তার পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড, সিনিয়রিটি ও বাজারের ডিমান্ড অনুযায়ী ফী নিয়ে থাকেন। এখন সব চিকিৎসক যদি একই ফী নেন, তাহলে কেউ উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে না এবং যেসব ডাক্তারদের ডিমান্ড বেশি তারাও রোগীদের যথাযথ সেবা দিতে হিমশিম খাবেন। কেননা, সবার ফী একই হলে সমস্যা কম হোক বা বেশি — সকলেই ডিমান্ডেড ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রবণতা দেখাবে, যার ফলে সেইসব ডাক্তার কম গুরুত্বপূর্ণ রোগীর চাপের কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগীদের যথাযথ সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হবেন। এজন্য, ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব আল্লাহর উপর রেখে দেওয়াতেই কল্যাণ রয়েছে।

কিছু কিছু মানুষকে সরকারি মেডিকেল থেকে পাশ করা ডাক্তারদের উপর কিছু অযৌক্তিক দাবী করতে দেখা যায়। যেহেতু, তারা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পড়ে ডাক্তার হয়েছে তাই তাদের ন্যায্য ফী নেওয়া, চাকরির জন্য বিদেশে যাওয়া বা ডাক্তারী প্রফেশন ছেড়ে অন্য প্রফেশনে যাওয়ার ব্যাপারে তারা প্রশ্ন তোলেন। ইসলামে এরকম দাবীর কোনো ভিত্তি নেই।

প্রথমত সরকার সরকারি মেডিকেলে পড়ার সুযোগ সকল জনগণকেই দেয়। যারা মেধাবী তারা পরিশ্রম করে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করেই এই সুযোগ গ্রহণ করে। এবং সরকারের সাথে তাদের এমন কোনো চুক্তি হয় না যে প্রাইভেটের শিক্ষার্থীদের থেকে কম সুবিধার বিনিময়ে সরকার তাদের পড়ার খরচ দিচ্ছে। এটা শিক্ষার্থী তার নাগিরক অধিকারের বলে মেধার পুরষ্কার হিসেবে অর্জন করে এবং এর কারণে সে কারো দাসে পরিণত হয় না।

সুতরাং, মানুষের উচিত চিকিৎসকদের পরিশ্রম সম্পর্কে আরো বেশি করে জানার চেষ্টা করা এবং সেগুলোকে মূল্যায়ন করা এবং না জেনে, না বুঝে, প্রবৃত্তির বশে কোনো মন্তব্য না করা। চিকিৎসকরা মানুষ, অর্থ উপার্জনের অধিকার তাদেরও রয়েছে। তবে, যদি কোনো চিকিৎসক কোনো গুরুতর রোগীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পারিশ্রমিক বাড়িয়ে নেন বা কৃত্রিম সিন্ডিকেট তৈরি করে সেবার মূল্য বৃদ্ধি করেন বা কমিশনের জন্য রোগীর অসুবিধা বৃদ্ধি করেন বা বেতন পাওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বে অবহেলা করেন বা ঘুষ নেন— তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে হারাম ও মানবতাবিরোধী কাজ হবে।

⬛ রোগী ও দ্বীনের প্রতি চিকিৎসকের কর্তব্য

একজন রোগী চিকিৎসকের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। চিকিৎসকের পরামর্শের উপর ভরসা করে তাকে সেই অনুযায়ী নিজের কষ্ট থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হয়। তাই, চিকিৎসকের দায়িত্ব এই যে রোগীকে পরামর্শ দেওয়ার সময় কোনো চিকিৎসা তথ্য গোপন না করা এবং রোগীর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে রোগীকে কোনো অহেতুক টেস্ট/ঔষধ দিয়ে কষ্টে না ফেলা।

➤ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “পরামর্শদাতা হলো আমানতদার।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৭৪৫; সহিহ)

রোগী অনেক সময় চিকিৎসককে বিশ্বাস করে তার অনেক গোপন তথ্য দিয়ে থাকে যেগুলো অন্য কেউ জানতে পারলে সে বিব্রত হবে। এগুলোও চিকিৎসকের নিকট আমানতস্বরূপ। চিকিৎসকের ওয়াজিব দায়িত্ব এটাও যে তার দ্বারা যেন রোগীর প্রাইভেসি বা মান-সম্মানের কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখা।

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কোন ব্যক্তি কোন কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনেছে কিনা তা দেখলে) তা আমানতস্বরূপ।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৬৮; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮০; সহিহ)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না।... কোন মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের জান-মাল ও ইযযত-আবরু হারাম।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৬৪; সহিহ)

পরামর্শকের পাশাপাশি একজন শল্যচিকিৎসক যখন রোগীর সার্জারী করেন তখন রোগীর শরীর তার কাছে আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকে। সুতরাং, চিকিৎসকদেরকে রোগীর এসব আমানত রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

➤ নবী ﷺ বলেন, "চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়।
১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে;
২. কথা বললে মিথ্যা বলে;
৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং
৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি করে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪; সহিহ)

➤ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "চারটি গুণ যদি তোমাকে দান করা হয় তবে পার্থিব অন্য কিছু না পেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই।
১. উত্তম স্বভাব-চরিত্র,
২. উত্তম ও পরিচ্ছন্ন (হালাল) রিযিক,
৩. সত্য ভাষণ এবং
৪. আমানত সংরক্ষণ।" (আদাবুল মুফারাদ, হাদিস নং ২৮৮; সহিহ)

শল্যচিকিৎসকদের কাজটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে সামান্য ভুলের কারণে রোগীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এজন্য, এই ক্ষেত্রে আসলে দায়িত্বভারের ওজন বুঝেই আসতে হবে এবং খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। যদি কোনো শল্যচিকিৎসক অবহেলাবশত রোগীর ক্ষতি করে ফেলে তাহলে এক্ষেত্রে তাকে শাস্তি হিসেবে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করতে হয়।

➲ ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এটা আমাদের কাছে একটি সর্বসম্মত বিধান যে, যদি হাজ্জাম খতনা করবার সময় (অবহেলাবশত) ভুলে অতিরিক্ত জায়গা কেটে ফেলে তবে তার দিয়াত দিতে হবে। এইরূপে যদি চিকিৎসক ভুলে কোন ত্রুটি করে ফেলে, তবে তাতে দিয়াত দিতে হবে।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, দিয়াত অধ্যায়)

এছাড়া, একজন নার্স বা চিকিৎসকের নৈতিক কর্তব্য এটাও যে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যথাসম্ভব তার রোগীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং তাকে হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করবেন।

➤ নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে (সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য) বলতেন, "কোন ক্ষতি নেই। ইনশাআল্লাহ তুমি তোমার গুনাহসমূহ থেকে পবিত্রতা লাভ করবে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬৫৬; সহিহ)

➤ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "রোগীকে দেখতে যাবার পর নিয়ম হলো, রোগীর কাছে বসা। তার কাছে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৮৯)

➤ নবী ﷺ বলেন, "কুষ্ঠ রোগীদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকো না। (কেননা এদ্বারা সে বিব্রত হয়)" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫৪৩; হাসান)

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা রোগী কিংবা মৃতের নিকট উপস্থিত হলে (তার সম্পর্কে) ভালো কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বলবে, ফেরেশতারা তার উপর আমীন' বলবেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৪৪৭; সহিহ)

এছাড়া রোগীরা যেহেতু চিকিৎসকদের জ্ঞানকে সম্মান করে তাদের পরামর্শকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করে থাকেন। সুতরাং, একজন চিকিৎসকের চেষ্টা করা উচিত রোগীকে সাধ্যমত দ্বীনের ব্যাপারে দাওয়াত-নসীহত করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করা।

➤ নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর শপথ! যদি তোমার চেষ্টার দ্বারা আল্লাহ একটি লোককেও হেদায়াত দেন, তবে তা হবে তোমার জন্য একপাল (আরবের মহামূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৬১)

যদি কোনো রোগী মৃত্যুশয্যায় পৌছে যান এবং নার্স বা চিকিৎসক সেই অবস্থায় তার পাশে থাকেন, তাহলে নার্স বা চিকিৎসকের উচিত সম্ভব হলে রোগীকে কালিমার তালকীন দেওয়া। আর যদি কোনো রোগী মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে নার্স বা চিকিৎসকের উচিত মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ করে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, জীবনের ঠুনকো বাস্তবতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই) তালকীন দাও (পড়াও)।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৯১৬; সহিহ)

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা বেশি পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারীর অর্থাৎ মৃত্যুর স্মরণ কর।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩০৭; সহিহ)

⬛ পরিবার ও নিজের প্রতি চিকিৎসকের কর্তব্য

দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক চিকিৎসক মানবসেবায় এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তারা নিজেদের কথা একেবারে ভুলে যান। তারা সবাইকে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে পরামর্শ দেন অথচ নিজেরাই নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করেন। এসকল ত্যাগ-তিতিক্ষা মহান হলেও সেগুলোর একটা সীমা থাকা উচিত। নিজেকে বিসর্জন দিয়ে কোনো ইবাদত করতে ইসলাম আমাদেরকে বলে নাই।

➤ রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বলেন, "আমি কি এ কথা ঠিক শুনিনি যে, তুমি সওম পালন করতে থাক আর ছাড় না এবং তুমি (রাতভর) সালাত আদায় করতে থাক আর ঘুমাও না?... (এমন না করে বরং) তুমি সওম পালন কর এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও। রাতে সালাত আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও। তোমার পরিবারেরও হক তোমার উপর আছে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৯৭৭; সহিহ)

অনেক চিকিৎসক তাদের পেশাকে এত বেশি গুরুত্ব দেন যে তারা ব্যস্ততার কারণে নিজের পরিবারকে সময় দেওয়ার সুযোগ পান না। দায়িত্বের চাপে পরিবারের সাথে সম্পর্ক গভীর করা তাদের কাছে বিলাসিতার মত হয়ে ওঠে। কিন্তু, একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রী-সন্তান ও বাবা-মার ভরণপোষণের পাশাপাশি তাদের পাশে থেকে তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসাও জরুরী। পারিবারিক সুখ-শান্তির জন্য টাকা-পয়সার থেকে পারস্পারিক দৃঢ় বন্ধন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, চিকিৎসকদের উচিত চাহিদার অতিরিক্ত অর্থের পেছনে না ছুটে পরিবারের সাথে কিছু আন্তরিক সময় কাটানো। কেননা, পরিবারের সাথে সময় কাটানো অনেকক্ষেত্রে জিহাদের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি পরিবারকে বেশি সময় দেওয়া অসম্ভব হয়, তাহলে চেষ্টা করতে হবে যেন অল্প যেটুকু সময় পাওয়া যাবে পরিবারের জন্য; সেটুকু সময় যেন আন্তরিক হয়।

➤ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মাঝে সে-ই ভাল যে তার পরিবারের নিকট ভাল। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চাইতে উত্তম।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৯৫; সহিহ)

➤ হযরত উসমান ইবনু আফফান রাদিআল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, কেননা ঘরে তার (নবীকন্যা) স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। রাসুল ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব ও (গণীমতের) অংশ তুমি পাবে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩১৩০; সহিহ)

➤ এক ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর কাছে এসে তাঁর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইলো। তখন নবী ﷺ বললেন, "তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছে?"

সে বলল, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "তাহলে তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জনের জিহাদ-সাধনা (চেষ্টা) কর।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৪৯; সহিহ)

➤ কতক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, "আপনারা কি আপনাদের শিশুদের চুমু দেন?"

সাহাবীগণ বলেন, "হাঁ।"

তারা বললো, "কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমরা চুমু দেই না।"

তখন নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি আর কী করতে পারি?" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৬৬৫; সহিহ)

বিশেষ করে নারী চিকিৎসকদেরকে পরিবারকে সময় দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। কেননা, একজন নারীর জন্য ডাক্তার হওয়া বা উপার্জন করা ফরজ নয়; কিন্তু স্বামীর খেদমত ও সন্তান লালন করা ফরজ। পেশার কারণে স্বামী-সন্তানের হক নষ্ট করলে সওয়াবের বদলে উলটো গুনাহ হবে। ডাক্তারী পেশার ফজিলত যতই বেশি হোক না কেন তা কখনোই স্বামীর খেদমত ও সন্তান লালন করার মহান দায়িত্বকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না।

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "কোন স্ত্রী যদি তাঁর স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানতো, দিনে বা রাতের খাবার শেষ করে স্বামীর পাশে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো।" (সহিহুল জামে, হাদিস নং ৫২৫৯)

➤ রাসুল ﷺ বলেন, "স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেঁটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না।" (সহিহুল জামি, হাদিস নং ৩১৪৮)

➤ আসমা বিনতু ইয়াযিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহা একবার নবিজী ﷺ কে বললেন, "আল্লাহর রসূল, আমি নারীদের পক্ষ হতে আপনার নিকট এসেছি। আল্লাহ আপনাকে নারী-পুরুষ সবার নিকট রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আপনার উপর ও আপনার প্রতিপালকের উপর আমরা ইমান এনেছি। আমরা ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দিই, সন্তান গর্ভে ধারণ করি। (বিভিন্ন কারণে) আমাদের উপর পুরুষদের ফজিলত আছে। তারা জামাতের সাথে সালাত আদায় করে, অসুস্থদের দেখতে যায়, জানাজায় অংশগ্রহণ করে, একের পর এক (নফল) হজ্ব করে। সবচেয়ে বড় ফজিলতের ব্যাপার হলো, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে পারে। তো আমরা কিভাবে তাদের মতো ফজিলত ও সওয়াব লাভ করতে পারব?"

নবি ﷺ এই মহিলা সাহাবির কথা শুনে বেশ খুশি হলেন। এবং বললেন, "তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন করো এবং অন্যান্য মহিলাদের একথা জানিয়ে দাও। স্বামীর সাথে সদাচারণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা — (পুরুষদের) ওইসব আমলের সমান সওয়াব ও মর্যাদা রাখে।" (বাইহাকি, শুআবুল ইমান, হাদিস নং ৮৩৬৯; যইফ বর্ণনাযোগ্য)

➤ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "নারীদেরকে অবশ্যই পুরুষদের (স্বামীদের) আনুগত্য করতে হবে। তাদের কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর সম্পদের হিফাজত করা ইত্যাদি।" (তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা আন-নিসা আয়াত ৩৪ এর ব্যাখা)

➤ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ কি এতে খুশি নয় যে, সে যখন স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকে তখন (এই গর্ভকালীন) সে আল্লাহর পথে সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারারাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পাবে? তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয় তখন তার জন্য (জান্নাতে) নয়ন শীতলকারী কী কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার পরিবর্তে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (অসুখ ইত্যাদির কারণে বিরক্ত করে মাকে ঘুমাতে না দেয়) তাহলে সে আল্লাহর পথে নিখুঁত সত্তরটি গোলাম আযাদ

করার সওয়াব পাবে।” (আলমু'জাম, তাবরানী, হাদিস নং ৬৯০৮; মাজমাউজ জাওয়াইদ: ৪/৩০৫; যইফ আমলযোগ্য)

যদি কোনো ডাক্তার জীবিকার দায়িত্বের তাগিদে এবং সিস্টেমের কারণে বাধ্য হয়ে পরিবারের জন্য সময় কম পান — তাহলে এতে তিনি দোষী নন; বরং পরিবারের উচিত এমন ক্ষেত্রে তাকে সাপোর্ট করা। তবে, অনেক ডাক্তার নিজের ও পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত আয় করা সত্ত্বেও স্রেফ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থেকে নিজের পারিবারিক সময়কে ত্যাগ করে আরো উপার্জন করার জন্য মাঠে নামেন। এটা ফিতনা ব্যতীত কিছু নয়। দুনিয়া কামাই ইবাদত তখনই যখন সেটা প্রয়োজন অনুযায়ী করা হয়। অন্যদের থেকে বেশি আয় করার থেকে নিজের পরিবারকে সময় দেওয়া এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

❝ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। ❞ (সূরা আত তাকাছুর, আয়াত ১-৩)

➤ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকেদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তবে তোমাদের চেয়ে উঁচু স্তরের লোকেদের দিকে লক্ষ্য করো না। কেননা আল্লাহর নি'আমাতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯৬৩; সহিহ)

নিজের অবস্থাকে সবসময় অন্যদের সাথে তুলনা করা একটি আত্মবিধ্বংসী অভ্যাস। ধন-সম্পদ থেকে যে সুস্থতা, মনের প্রফুল্লতা ও পরিবারের উপস্থিতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা সংক্রান্ত হাদিস এই বইয়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো এখানে রিপিট করলাম না। একজন ডাক্তার ডাক্তার হওয়ার পূর্বে একজন সন্তান, অভিভাবক, সঙ্গী বা সহোদর এবং তারও পূর্বে তিনি একজন মানুষ। পেশা কখনোই আত্মগ্রাসী বা পরিবারগ্রাসী হওয়া উচিত নয়।

আল্লাহর জন্য ডাক্তারদের মাঝে এই ইঁদুর দৌড়ের সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ডাক্তার কমিউনিটির মাঝে একটি inferiority complex আছে। তাদের ধারণা, তারা যদি পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মান-মর্যাদা অর্জন করে অনেক বড় পর্যায়ে না যেতে পারেন তাহলে তাদের Doctorhood ব্যর্থ। তাদেরকে ভুল প্রমাণিত করার জন্যই এই বইটি রচিত। কেননা, একজন ডাক্তার তার Doctorhood এর ওসিলায় আখিরাত গঠনের যে বিশাল সুযোগ পান তার তুলনায় এসব কিছুই না। তাই, এইসমস্ত মূল্যহীন সামাজিক এক্সপেক্টেশনের ধোঁকায় পড়ে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে ত্যাগ করা উচিত না।

এবার, আমি আমার ছোটবেলার একটা প্রিয় লাইন উল্লেখ করে এই বইয়ের সমাপ্তি টানতে চাই।

“No point in saving the Universe, if you lose your family.”
- *(Grandpa Max, Ben 10 Destroy All Aliens)*